বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৬ এপ্রিল-জুন - ২০০৬

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ ২, সংখ্যা ৬

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে
জেনারেল সেক্রেটারী, এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ২০০৬

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭ ১২৮২৭২৭৬
Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh
Bank Account No. MSA 02104641
IBBL, Shymoli Branch, Dhaka.

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা

দাম : ৩৫ টাকা
US $ 3

Published by Advocate ***MUHAMMAD NAZRUL ISLAM****. General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3*

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

বিচার ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য

একজন মানুষ অবিবেচক হতে পারে না। বিচার বিবেচনা করেই মানুষকে কাজ করতে হয়। কমবেশি সবার মধ্যে বিবেচনা শক্তি এবং নিজের কাজগুলো বিচার করার ক্ষমতা আছে। সীমিত বা বিস্তৃত পর্যায়ে কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় একজনের সাথে অন্যজনের বিরোধ দেখা দেয়। একজনের বিচার বিবেচনা একরকম অন্যজনের অন্যরকম। একজন যখন অন্যজনেরটা কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারে না তখন তৃতীয় জনের প্রয়োজন হয়।

এজন্য আল্লাহ প্রথমেই বলে দিয়েছেন, হকদারকে তার হক দিয়ে দাও।[১] অর্থাৎ আমার বিবেচনায় আমি যদি দেখি এটা আমার প্রাপ্য নয় অন্যের প্রাপ্য তাহলে তার প্রাপ্য তাকে দিয়ে দেয়া আমার মানবিক কর্তব্য। আর এরপরও যদি আমি এটা কব্জা করে রাখি তাহলে ফাসাদ বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য আমিই দায়ী হবো। এটিই হচ্ছে মানবিক বিচার বিবেচনার প্রথম কথা। আল্লাহর দুনিয়ায় মানুষের বিচরণ, মানুষের কার্যক্রম, মানুষের জীবন যাপন ও জীবনাচরণ এসবের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ শক্তি ও প্রেরণা আছে যা তাকে সবসময় পরিচালনা করার ও পথ দেখাবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা ছাড়াও যে কোনো মানুষ এমনিতেই দায়িত্বশীল এবং এ দায়িত্ব সে উপলব্ধি করে। কাজেই নিজের অধিকার নেয়া এবং অন্যের অধিকার দেয়া স্বাভাবিক মানবিকতারই একটি অংশ। এজন্য আবহমানকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষের যে পরিমাণ শক্তি সামর্থ বুদ্ধি মেধা ও নিয়ম ব্যবহৃত হচ্ছে এর সবই মানবিক সমাজে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে মহাদেশে গোষ্ঠীতে জনপদে যুগে যুগে মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তোলে সেখানে বিচার ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ইউরোপীয় সভ্যতা যাকে আমরা আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে থাকি এবং ইউরোপ উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো তিনটি মহাদেশ যার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করছে সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিচার বিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। সমস্ত দেশের আইন শৃংখলা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা এবং দেশের জনগণকে ন্যায় বিচার দান করাই এর লক্ষ। এই বিচার বিভাগের কারণেই পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার লাভ ও ন্যায় বিচারের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এজন্য বড় বড় কোর্ট কাছারী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিচারপতি ও আইনবিদগণ দিন-রাত পরিশ্রম করছেন, মাথা ঘামাচ্ছেন। বড় বড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পঠন পাঠন চলছে। মোটকথা সর্বস্তরের জনসাধারণকে আইনের সেবা দেয়ার জন্য

---

১. 'আল্লাহ তোমাদের হুকুম দিচ্ছেন 'আমানত' ফিরিয়ে দাও তার হকদারদেরকে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।' (আন নিসা : ৫৮)

আইনের লোকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এই সভ্যতার একটি অবিস্মরণীয় অবদান।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বিচারপতি ও বিচারালয় এখানে পবিত্র মর্যাদার অধিকারী। তারা ন্যায়নীতির চর্চা করে যাচ্ছেন। দুনিয়ায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? প্রকৃত পক্ষে কি দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে? এখন কেবল তিনটি মহাদেশ নয়, এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ ছয়টি মহাদেশেই একই বিচার ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই কি মানুষ ন্যায় ও ইনসাফ লাভ করছে? বিচার ব্যবস্থার কাঠামো আছে এবং ন্যায় ও ইনসাফের ফায়সালাও হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যায় ও অবিচারে সারা দুনিয়া ছেয়ে যাচ্ছে। যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রটির বিচার বিভাগ ন্যায়ের ফায়সালা দিচ্ছে সেই রাষ্ট্রটির কর্মকর্তারা অন্যায়ের পতাকা নিয়ে সারা দুনিয়ায় অন্যায় ও জুলুমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করছে। আইন যদি অন্যায় করার সুযোগ না দেয় তাহলে কেন আইনকে টপকে গুয়ান্তানামোর মতো মানবতার নির্যাতনের বিশ্বইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্ক্যাণ্ডেল পরিচালনায় তাদের বিবেকে বাধে না। যেন তাদের এই অবৈধ কাজকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো আইন আদালত বিচার ব্যবস্থা তাদের দেশে নেই।

মূলত বিচার ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। ব্যক্তি মানুষের মধ্যেও যে বিচার বিবেচনা বোধ আছে তাও ব্যক্তি পর্যায়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়। সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবে কেন?

এর মোকাবিলায় আমরা দেখি মুসলমানদের বিশ্ব শাসনের যুগে হাজার বছরেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ ফল বিশ্ববাসী লাভ করতে পেরেছে। ইসলামী ও কুরআনী আদর্শবাদ থেকে মুসলমানরা যতই বিচ্যুত হতে থেকেছে ততই এর সুফল কমতে থেকেছে। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা বিশ্বে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ উঠে গিয়েছিল। মানুষ যে দেশের এবং যে জাতিগোষ্ঠীরই হোক না কেন সমান ইনসাফ পাবার অধিকারী হয়েছিল। সেখানে হকদারকে তার হক ও অধিকার ফেরত দেবার কথা বলা হয়েছে। এটিই হচ্ছে ইনসাফের প্রথম কথা। হকদার তার হক এবং অধিকার বঞ্চিত মানুষ তার অধিকার ফিরে পেলেই আসল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আদালতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু জনসমাজে অন্যায়ের আধিপত্য চলতে থাকবে এতে আদালতের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে জনসমাজেও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

–আবদুল মান্নান তালিব

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে। যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস
২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ
৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান
৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা
৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার
৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন
৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম
৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি

লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ শ্যামলী রিং রোড, পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা), শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭২ ৮২৭২৭৬, E-mail : ilrclab@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইস্‌লামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্যে রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

পাঠকের মতামত আমরা আগ্রহ সহকারে ছাপাই।

গ্রাহক চাদার হার

প্রতি সংখ্যা : টাকা ৩৫, প্রতি ৬ মাসে : টাকা ৭০, প্রতি বছরে : টাকা ১৩০

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ৭-১৮

রসূল স. এর বিচার

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল উন্দলুসী

বিচার বলতে আমরা যা বুঝি আরবীতে তাকে বলা হয় কাযা।

কাযা শব্দের আভিধানিক অর্থ

কাযা শব্দের আভিধানিক অর্থ ফয়সালা করা, সিদ্ধান্ত দেয়া। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক ফয়সালা দিয়েছেন, তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করতে পারবে না।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত- ২৩)
আরবী কাযা শব্দের বহুবচন আক্যিয়া। আরবী ভাষায় বলা হয়, 'কাযা আলাইহি য়াক্যি' 'সে তার বিরুদ্ধে ফয়সালা দিয়েছে।' এর শব্দমূল কাযাউন এবং কাযিয়াতুন। (লিসানুল আরব পৃষ্ঠা- ৬)

শরীয়তের পরিভাষায় কাযা

ইবনে রুশদ বলেন, কাযা হলো শরীয়তের এমন ধরনের ফয়সালা যা আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য অলঙ্ঘনীয়। ইবনে আবেদীন আল্লামা কাসেম সূত্রে বলেন, পার্থিব কোন বিবাদ বা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইজতিহাদ ভিত্তিক কোন সিদ্ধান্তকে আবশ্যিক মনে করার নাম কাযা।[১] মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. বলেন, কোন অভিজ্ঞ শাসকের ফয়সালাকে বলা হয় কাযা যা পালন করা আবশ্যিক। শরীয়তে মামলা মোকদ্দমা ও বিবাদ মীমাংসাকেও কাযা হিসাবে অভিহিত করা হয়। উপরে উল্লেখিত সংগা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সমকালীন শাসক কাযীর ফয়সালা বাস্তবায়নকে জরুরী মনে করতেন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কাযা তথা বিচারের ফয়সালা আর ফাতওয়া এক জিনিস নয়। যদিও ফাতওয়া ও কাযা উভয়টি কোন না কোন শরয়ী ফয়সালা প্রকাশের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য হলো, যার ব্যাপারে ফাতওয়ার ফয়সালা দেয়া হয় এই ফয়সালা মান্য করা তার উপর ওয়াজিব নয় কিন্তু কাযী যে ফয়সালা দেন তা পালন করা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব।
তাশ কুবরাজাদা নিম্নোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে ফাতওয়ার সংগা দিয়েছেন,[২] অভিজ্ঞ ফকীহগণ ছোটখাটো বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ফাতওয়ায় এমন সব বিধান সংকলন করা হয়।

লেখক, মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ ইবনে তুল্লা আলউন্দলুসী ৪০ হিজরী সনে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৫৯২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সমকালীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। আকযিয়াতুর রসূল স. তাঁর অমর রচনা যা আজো সারা বিশ্বে মুসলমান গবেষক ও পাঠকদের কাছে অদ্বিতীয় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে আদৃত।

ফকীহদের এসব সিদ্ধান্ত দেয়ার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে যারা ইলমে ফিকহে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবে না তাদের জন্য ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারটি সহজ করে দেয়া।'

উপরে বর্ণিত সংগা থেকে বুঝা যায় ফাতওয়ার ওপর আমল করা বা ফাতওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা জরুরী নয়। বরং এ সংগার ভিত্তিতে কাযীদের তুলনায় মুফতীদের অবস্থান নিরাপদ। কেননা শুধু ফাতওয়া দেয়ার দ্বারা কারো ওপর কোন করণীয় বর্তায় না। কেননা কেউ যদি মুফতীর কাছে ফাতওয়া তলব করে, মুফতী সে ক্ষেত্রে ফাতওয়া বলে দেন, ইচ্ছা করলে সেই ফাতওয়া সেই ব্যক্তি পালন করতে পারে আবার নাও পালন করতে পারে। এর বিপরীতে কাযী যে ফয়সালা দেন তা পালন করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে জরুরী। এদিক থেকে মুফতীর তুলনায় কাযীর কার্যক্রম অনেক বেশি নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ। হাফেজ ইবনে কাইয়েম তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'ই'লামুল মু'কিয়ীন' গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করেছেন (খণ্ড-১ পৃ: ৩৬০)

বিচার কক্ষে বসে কাযীর ফাতওয়া দেয়ার বিষয়টি আলেমগণ পসন্দ করেননি। কেননা এমতাবস্থায় বিচারকের ফয়সালা আর ফাতওয়ার মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। কাযী শুরাইহি ও অন্য বিচারকগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন। একবার কোন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা সম্পর্কে কাযী শুরাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি বিচারকের ফয়সালা দিচ্ছি, ফাতওয়া নয়।'[৩]

ইসলামে কাযা'র গুরুত্ব

পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই এমন এক ধর্মমত যাতে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ের সমন্বিত বিধানের নাম ইসলাম। ইসলাম একদিকে মানুষকে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ করে আবার অন্য দিকে দুনিয়াতে মানুষের সাথে গভীর হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি নিয়ে বসবাসের দীক্ষা দেয়। ধর্মীয় ব্যাপারে একজন মুসলমানের জন্য তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা বাধ্যতামূলক। অনুরূপ দীনের আরকানসমূহের মধ্যে নামায, যাকাত, রোযা পালনের বাধ্যবাধকতা এবং সক্ষম ও বিত্তশালীদের জন্যে হজ্জপালন জরুরী। পার্থিব কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিয়ে শাদী, তালাক, কেনাবেচা, উত্তরাধিকার, দান অনুদান, ওয়াকফ, ওসিয়ত ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে শরীয়তের বিধি নিষেধ মেনে চলা ফরয।

কিন্তু এসব বিধি নিষেধের অর্থ এই নয় যে, দীন ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ড একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং দীন ও দুনিয়া একটি আরেকটির অংশ এবং পরিপূরক। দৃশ্যত দীন ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা নিছক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফকীহগণ শরীয়তের বিধানকে যখন ইবাদাত ও মুআমালাত হিসেবে পৃথক করেন এর অর্থ হয় মৌলিকভাবে এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ কোন মুসলমানের পক্ষে যেমন মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনটি মানা এবং কোনটি না মানার স্বাধীনতা নেই অনুরূপ দুনিয়াবী বিধি বিধানের ক্ষেত্রেও কোনটি মানা এবং

কোনটি না মানার অধিকার নেই। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই, যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানী করে সে স্পষ্ট পথভ্রষ্ট। (সূরা আহযাব- ৩৬) ইসলাম আকায়েদ ও মুআমালাতকে এমন ভাবে সংযুক্ত করে দিয়েছে যে একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করার উপায় নেই। রসূল স. এর ওপর মানুষকে আত্মিক ও মানসিকভাবে পরিশুদ্ধ ও প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, অনুরূপ মানুষের মধ্যে সৃষ্ট ঝগড়া বিবাদ ও বিরোধ মেটানোর দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিল। যাতে কোন ক্ষমতাবান দুর্বলের ওপর জুলুম অত্যাচার না করতে পারে এবং তার অধিকার হরণ করতে না পারে। কারণ সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে লোভ লালসা অন্যের ওপর আধিপত্য ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। এসব মন্দ থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখার জন্যে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। কুরআন মজীদ তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও শিরক নির্মূলের বিধান দেয়ার পর মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং অত্যাচারী ও আগ্রাসীদের দমনে শাস্তি ঘোষণা করে মানুষের সব ধরনের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে এবং জালেম অত্যাচারী অপশক্তিকে ন্যায় বিচারের কাছে মাথানত করার কার্যকর ব্যবস্থা করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে— এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করো তখন ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করবে। (সূরা নিসা- ৫৮)

আল্লাহ তাআলা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামকেও এজন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন যাতে তাঁরা তাদের শরীয়তকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে-এবং যখন তোমার প্রভু ফেরেশ্‌তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই। (সূরা বাকারা-৩০)

কাযার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা

ধর্মীয় চেতনার দৃষ্টিতে কাযীর দায়িত্ব শুধু এতটুকু নয় যে তিনি কোন ঘটনার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান ঘোষণা করবেন এবং সেটি বাস্তবায়ন করবেন বরং যেসব বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই সেই খুটিনাটি বিষয়ে নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে উদ্ভূত প্রত্যেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেয়াও কাযীর কর্তব্য। কোন ঘটনার মূল কারণ উদঘাটন করা এবং সে ব্যাপারে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ও প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা একটি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি। ইসলামী আইনে কাযী বা বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ফিকহী মতভিন্নতা সম্পর্কে গভীরতা থাকার পাশাপাশি উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানের মতো বিচক্ষণতা একটি অনন্য যোগ্যতা ও গুণ। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে বিচার করার গুণ সমভাবে হযরত দাউদ ও সুলায়মানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন কিন্তু উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধান এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে হযরত সুলায়মানের

বিচক্ষণতাকে আল্লাহ্ তাআলা অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে–'এবং স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল। রাতের বেলায় সেই শস্যক্ষেতে কোন সম্প্রদায়ের মেষ প্রবেশ করেছিল, আমি তার বিচার ফয়সালা প্রত্যক্ষ করছিলাম এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বস্তুত তাদের উভয়কেই আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।' (সূরাঃ আম্বিয়া- ৭৮-৭৯)
প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অনন্য দৃষ্টান্ত হলো জামার পিছন দিকে ছেঁড়া দেখে এক ব্যক্তির হযরত ইউসুফকে আ. সত্যবাদী বলে ঘোষণা করা। কারণ সে জামা দেখেই বুঝে নিতে পেরেছিল ইউসুফ সত্যবাদী। প্রকৃত পক্ষে ইউসুফ এই অভিযোগে জড়িত নয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে– ইউসুফ বলল, 'সেই (জুলাইখা) আমাকে অসৎকর্ম সম্পাদনের আহ্বান করেছিল।' মহিলার পরিবারের এক লোক সাক্ষ্য দিল, যদি তার (ইউসুফের) জামার সম্মুখ দিক ছিঁড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই (জুলাইখা) সত্যবাদী সাব্যস্ত হবে এবং সে (ইউসুফ) হবে মিথ্যাবাদী। কিন্তু তার জামা যদি পিছন দিকে ছিঁড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই (জুলাইখা) মিথ্যা বলেছে, সে (ইউসুফ) হবে সত্যবাদী। গৃহস্বামী যখন দেখল, তার (ইউসুফের) জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের (নারীদের) চক্রান্ত। নারীদের চক্রান্ত খুবই জঘন্য।' (সূরা ইউসুফ- ২৬-২৮)
হযরত উমর রা. তাঁর বিখ্যাত পত্রে এ বিষয়েই হযরত আবু মূসা আশআরী রা. এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। হযরত উমর রা. সেই পত্রে লিখেছিলেন, 'তোমার সামনে যদি এমন কোন ব্যাপার উপস্থাপন করা হয় যে সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহতে পরিষ্কার কোন প্রমাণ উল্লেখ নেই, তাহলে বিষয়টির ব্যাপারে তুমি গভীর চিন্তা ভাবনা করে এর মূল রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করবে।'
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম র. বলেন, সঠিক বুদ্ধি বিবেচনা এবং ঐকান্তিক সংকল্প আল্লাহ তাআলার দেয়া অনেক বড় নেয়ামত। একথাও বলা যায় যে, ইসলামের নেয়ামতের পরে যে কোন মুসলমানের জন্য এ সদিচ্ছা ও বিচক্ষণতা সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এ দুটি জিনিস ইসলামের বিরাট স্তম্ভ। এই দুটি স্তম্ভের উপরই ইসলামের প্রাসাদ অস্তিত্বমান। (ই'লামুল মু'কিয়ীন খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৮৭)
সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যাকে কল্যাণের বারিধারায় স্নাত করেন, তাকে দান করেন দীনের অগাধ জ্ঞান।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. সম্পর্কে রসূল স. বলেন, হে আল্লাহ, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করো এবং কুরআনের ভাষা ও মর্ম তাকে উপলব্ধি করার শক্তি দান করো। (সহীহ বুখারী, বাবু যিকরি ইবনু আব্বাস) মুসনাদে আহমদ-এ এসব শব্দ বর্ণিত হয়েছে, 'হে আল্লাহ! তার ইলম ও বোধ শক্তি বাড়িয়ে দাও। (মুসনাদে আহমদ খণ্ড-১ পৃঃ ৩৩)
হযরত উমর রা.-কে আল্লাহ তাআলা গভীর অনুভূতি ও বিচক্ষণতা দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর দেয়া বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা কাজে লাগিয়ে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা ও সংকট উত্তরণে ইজতিহাদ করতেন, যেগুলোর ব্যাপারে পরিষ্কার কোন দলীল প্রমাণ নেই। হযরত উমর রা. এর অধিকাংশ

ইজতিহাদই সঠিক হতো, ভুলের সম্ভাবনা তেমন থাকতো না। রসূল স. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা উমরের মুখে সত্যের প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। হযরত উমর রা. এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, হযরত উমর যদি কোন বিষয়ে বলতেন, 'আমার মতে এটি এমন হওয়া উচিত- 'প্রকৃত পক্ষে সেটি তদ্রূপই হতো।'

অনুরূপ হযরত আলী রা. এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারও খ্যাতি ছিল। বিবাদ ফয়সালার ব্যাপারে একটি ঘটনা তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি ও বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, 'আমি রসূল স. এর কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় ইয়েমেন থেকে একজন লোক এসে বলল, ইয়েমেনের তিন অধিবাসী একটি মোকদ্দমা নিয়ে হযরত আলী রা. এর কাছে আসল। একটি ছেলের অভিভাবকত্ব নিয়ে ছিল তাদের বিরোধ। কারণ তারা একই তহুরে একই মহিলার সাথে সহবাস করেছিল। হযরত আলী এদের দু'জনকে একান্তে ডেকে বললেন, এই সন্তান তোমাদের নয় তৃতীয় ব্যক্তির। এতে দু'জনই চরম ক্ষেপে গেল। এরপর এই দু'জনের একজনকে বাদ দিয়ে অন্য দু'জনের সাথে একই কথা বললে, এরা দু'জনও ক্ষেপে গেল। এরপর তিনি অপর দু'জনকে ডেকে একই কথা বললেন, তারাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠলো। এরপর হযরত আলী তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা একটি বিতর্কিত জিনিস নিয়ে ঝগড়া করছো। এখন আমি তোমাদের মধ্যে লটারী দেবো। লটারীতে যার নাম আসবে তার হাতেই ছেলেকে তুলে দেবো। আর অপর দু'জনকে এক তৃতীয়াংশ করে দিয়্যত (জরিমানা) দিতে হবে। এরপর হযরত আলী লটারী দিয়ে যার নাম এলো ছেলে তাকে দিয়ে দিলেন। এই ঘটনা শুনে রসূল স. এমন হাসলেন যে তাঁর দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

আবু দাউদ[৪] এবং ইবনু মাজাও[৫] এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য কোন কোন আলেম এই বর্ণনার ব্যাপারে দুর্বলতার কথা বলে এটিকে মুরসাল রেওয়ায়েত বলেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে হাযম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন।

সহীহ বুখারী[৬] ও সহীহ মুসলিম[৭] শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে বিচারের ক্ষেত্রে হযরত সুলায়মান আ. এর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন, দুই মহিলার দুটি শিশু সন্তান ছিল। একদিন একটি বাঘ এসে একটি শিশুকে নিয়ে গেল। তখন এক মহিলা অপর মহিলাকে বলতে লাগল, বাঘ তোমার বাচ্চাকে নিয়ে গেছে। এ নিয়ে দুই মহিলার মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হলো। উভয়েই বিবাদ মেটানোর জন্যে হরত দাউদ আ. এর শরণাপন্ন হল। হযরত দাউদ আ. বয়স্কা মহিলার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিলেন। এ ফয়সালায় দ্বিতীয় জন সন্তুষ্ট হতে পারেনি ফলে মামলাটি হযরত সুলায়মান আলাইহি ওয়া সালামের কাছে গেলো। তিনি দুজনকে ডেকে ঘটনা সবিস্তারে শুনলেন। হযরত সুলায়মান উভয়ের নালিশ শুনে বললেন, একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি শিশুটিকে দু'টুকরো করে উভয়কেই দিয়ে দেবো। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলা চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি এমনটি করবেন না। হযরত সুলায়মান আ. তখন শিশুটিকে অল্প বয়স্কা মহিলাকে দিয়ে বললেন, এই শিশুটির প্রকৃত মা সে।

যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে, হযরত সুলায়মান আ. এর পক্ষে তাঁর পিতার ফয়সালার বিপরীত ফয়সালা করা কি বৈধ ছিল? এর জবাব হলো, হযরত সুলায়মান আ. একটি দূরদর্শী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে পেরেছিলেন। তিনি উভয় মহিলার কথা শুনে শিশুটিকে প্রকৃত অর্থেই দু'টুকুরো করার জন্যে ছুরি আনতে বলেননি, বরং প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্যে তিনি পরীক্ষা হিসেবে এই কৌশল করেছিলেন। কিন্তু মাতৃত্বের মমতায় আপ্লুত হয়ে অল্প বয়স্কা মহিলা যখন দেখলো, তার শিশু চিরতরে হারিয়ে যাবে তখন সে আর্তচিৎকার করে ছেলের দাবী প্রত্যাহার করে বললো, 'ঠিক আছে, বাচ্চা তাকেই দিয়ে দিন কিন্তু দু'টুকরো করবেন না।' তখন হযরত সুলায়মানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, শিশুটির প্রকৃত মা বয়স্কা মহিলা নয়। শিশুটির জীবন বাঁচানোর জন্যেই সে এ কথা বলছে। কেননা বয়স্কা মহিলার মধ্যে শিশু হারানোর কোন উদ্বেগ ছিল না। বস্তুত হযরত সুলায়মান প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে শিশুটিকে তার প্রকৃত মায়ের কোলে সোপর্দ করলেন।

হাফেয ইবনে হাজার 'ফতহুল বারীতে' এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন। এই ঘটনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কোন ঘটনায় প্রকৃত পক্ষে সত্য এক পক্ষে থাকে। কাযী যদি বিচক্ষণ দূরদর্শী গভীর অনুসন্ধিৎসু না হন তাহলে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া তার জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ অনেক সময় বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই এমন জোরালো সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা পরখ করা বিচারকের জন্য দুরূহ হয়ে ওঠে।

সহীহ[৮] বুখারী এবং সহীহ মুসলিম শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটিতে রসূল স. এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। রসূল স. বলেন, 'আমিও তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা সমাধান করে দেয়ার জন্য আমার কাছে তোমাদের মোকদ্দমা নিয়ে আসো। তোমাদের অনেকেই এমন যে, প্রতিপক্ষের চেয়ে নিজের অবস্থা জোরালো ভাবে উপস্থাপন করতে পারো, বস্তুত পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, আমি বিরোধপূর্ণ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য ও যুক্তি দেখে না হকের পক্ষে ফয়সালা করে দেই অথচ এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যবাদী তার প্রতিপক্ষে থাকে। এমতাবস্থায় ভাইয়ের অধিকার থেকে সামান্য জিনিসও নেবে না। কারণ এটি হবে সেই ব্যক্তির জন্যে আগুনের টুকরো।'

এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কাযীর বিচার হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করতে পারে না। কিন্তু কাযীর ফয়সালা অবশ্যই কার্যকর হবে যদিও সেটি বাস্তবের পক্ষে হোক বা প্রকৃত সত্যের বিপরীতে হোক। এর কারণ হলো, বিচার সাক্ষী ও দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। কাযী বা বিচারকের যদি ঘটনার গভীরে প্রবেশ করার মতো বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকে তবে গণমানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে থাকবে। আর আগ্রাসীদের দাপট প্রতিষ্ঠা পাবে। মানুষের মধ্যে দেখা দেবে নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা। এর ফলে ভেঙে পড়বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। অকার্যকর হয়ে যাবে সরকারী প্রশাসন। বস্তুত এ ধরনের অস্থিরতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা সেই সব দেশেই সৃষ্টি হয়

যেসব রাষ্ট্রে ধর্মীয় নৈতিকতা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার বিচারে 'মানসম্মত ব্যক্তিদেরকে বিচারকের মসনদে না বসিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে এসব পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

রসূল স. এর ফয়সালার কয়েকটি উদাহরণ

প্রথম উদাহরণ : ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস বিন মালিক রা. এর একটি রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন। হযরত আনাস রা. বলেন, 'মদীনায় একটি বালিকা কিংবা এক দাসী রূপার তৈরি গহনা পরে ঘর থেকে বের হলে এক ইহুদী তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারল। আহত অবস্থায় আক্রান্তকে রসূল স. এর কাছে নিয়ে আসা হলো, তখনও আক্রান্ত দাসী বা বালিকার দেহে প্রাণ ছিল। রসূল স. তাকে দেখে বললেন, অমুক তোমাকে হত্যা করেছে? রসূল স. এর কথা শুনে বালিকা মাথা একটু খানি উপরে উঠালো। রসূল স. পুনর্বার তাকে একই প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কি অমুক হত্যা করেছে? বালিকা পুনর্বার মাথা উপরে উঠালো। রসূল স. আবার তাকে একই প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কি অমুক হত্যা করেছে? তৃতীয়বার বালিকা হ্যাঁ বাচক ভঙ্গি করে মাথা নীচে নামিয়ে নিল। এরপর রসূল . ইহুদীকে পাকড়াও করে এনে দু'টি পাথরের মাঝখানে তাকে চাপা দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করালেন।

সহীহ মুসলিম শরীফের কিতাবুল কাসামায় বলা হয়েছে, 'রসূল স. ইহুদীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। এতে সে মৃত্যুবরণ করে।

এই হাদীস দলিল হলো, নিহতকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে হত্যাকারীকেও সেভাবেই হত্যা করা হবে। এটিই জমহুরে ফুকাহা'র অভিমত। অবশ্য কুফার ফকীহগণ এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তারা বলেন, কিসাস কার্যকর করতে হবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে। তাদের এ মতের প্রমাণ হলো, হযরত নু'মান বিন বশীর রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীস। রসূল স. বলেন, কিসাস তরবারী দিয়েই কার্যকর করতে হবে। (ইবনু মাজা, কিতাবুদ দিয়্যত) হানাফী মতাবলম্বীদের একজন শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ইমাম কাসায়ী র. তাঁর কিতাব 'বাদায়ে ওয়াস সানায়ে' গ্রন্থের ৭ম খণ্ড, ৮৮৯ পৃষ্ঠায় এ অভিমত উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত নু'মান বিন বশীরের এই হাদীস ইমাম ইবনু মাজা তাঁর সংকলিত সুনান খণ্ড-২ পৃষ্ঠা ৮৮৯ এ নকল করেছেন। এই বর্ণনার তথ্য সূত্রে জাবের আল জা'ফী নামক যে বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি একজন বিখ্যাত মিথ্যা বর্ণনাকারী। আল-বাযযার, বায়হাকী, তাবরানী, তাহাবী এবং দারে কুতনীও শব্দের বিভিন্নতায় এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সবারই তথ্যসূত্র দুর্বল। ইবনু মাজা তাঁর সুনানে এ ধরনের রেওয়ায়েত আবী বাকরা সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার তথ্য সূত্রে মোবারক বিন ফুদালা নামের যে রাবী রয়েছেন তিনি একজন মুদাল্লিস।* কারণ তিনি হযরত হাসান বসরী র. সূত্রে 'আন হাসান' শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে হাজার র. বলেন, এ ব্যাপারে দারে কুতনী ও বায়হাকী হযরত আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করছেন যাতে লায়লা বিন হিলাল নামের রাবী মিথ্যুক বলে বিবেচিত। তারবানী ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

---

* মুদাল্লিস এমন একজন রাবীকে বলা হয় যিনি জেনে বুঝে সনদের দোষ ত্রুটি লুকিয়ে রাখেন এবং গুণগুলো প্রকাশ করেন।

মাসউদ সূত্রেও এ ধরনের হাদীস সংকলন করেছেন কিন্তু সেটির বর্ণনা সূত্রও খুব দুর্বল। হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন, এই রেওয়ায়েতের সব সনদই দুর্বল। বায়হাকী বলেন, এর কোন সনদই বস্তুনিষ্ঠতার মানে উত্তীর্ণ নয়। (দেখুন তালখিসুল হাবীহ খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ১৯)

দ্বিতীয় উদাহরণ : মুআত্তা কিতাবুল উকূল-এ ইমাম মালেক র. হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, হুযায়েল গোত্রের এক মহিলা আরেক মহিলাকে পাথর দিয়ে আঘাত করায় তার গর্ভপাত ঘটে। রসূল স. গর্ভপাতের দিয়্যত স্বরূপ একটি বাঁদী বা গোলাম দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সহীহ বুখারী কিতাবুল ফারায়েয-এ এই বর্ণনার সাথে ইমাম বুখারী একথাও যুক্ত করেছেন, যে মহিলার উপর রসূল স. দিয়্যত পরিশোধের নির্দেশ জারী করেছিলেন, সে মারা গেল। তখন রসূল স. বললেন, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি তো তার স্বামী ও সন্তানরা পাবে কিন্তু তার পক্ষ থেকে দিয়্যত আদায় করবে তার আসাবা অর্থাৎ তার পিতৃকূলের নিকটাত্মীয়রা। সহীহ মুসলিম শরীফের কিতাবুল কাসামায় ইমাম মুসলিম উল্লেখিত রেওয়ায়েতে এ কথাও যুক্ত করেছেন যে, এ সম্পর্কে হামল বিন নাবেগা আল হাযলী বলেন, 'আমি এমন মৃতের দিয়্যত কিভাবে পরিশোধ করবো যে কোন কিছু খায়নি, পান করেনি, কোন কথা বলেনি, চিৎকার করেনি? তার রক্ত তো বেকারই হবে।' এ কথা শুনে রসূল স. বলেন, 'সে তো গণকদের মতো আজগুবী কথা বলছে।'

হুযায়েল : হুযায়েল শব্দ হুযায়েল বিন মুদরিকার গোত্রের প্রতি নির্দেশ করে। মক্কার নিকটবর্তী নাযলা প্রান্তরে বসবাসকারীদের মধ্যে এই গোত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

কোন কোন বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদ উল্লেখিত দুই মহিলার নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের একজনের নাম ছিল মালীকা আর অপর জনের নাম ছিল উম্মে আযীফ। তাবরানী বলেন, যে পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল সে ছিল মালীকা।

রসূল স. যে মানের গোলাম দিয়্যত হিসেবে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন সেটির মূল্যমান ছিল ৫০ স্বর্ণমুদ্রা বা ৬০০ দিরহাম। ইমাম মালেক র.ও তাই বলেন। ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, গোলামের প্রকৃত মূল্য ছিল পাঁচশ দিনার কিন্তু নবী করীম স. এর একবিংশতাংশ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ এমনও হতে পারত এ বাচ্চা মৃত প্রসব হতো। এ জন্য ফকীহগণ বলেন, যদি গর্ভপাত হওয়ার পর শিশুটি জীবিত থাকে এবং কিছুক্ষণ পর আঘাতের কারণে তার মৃত্যু ঘটে তাহলে পূর্ণ দিয়্যত পরিশোধ করতে হবে। কেননা, তখন এটিকে পরিপূর্ণ একজন মানুষ মনে করা হবে। ইমাম মালেক র. এমতই তাঁর মুআত্তায় উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় উদাহরণ : ইমাম মালেক র. মুআত্তায় হযরত আবু হুরায়রা ও খালেদ আল জুহানী রা. এর বর্ণনা নকল করেছেন। দুজন লোক রসূল স. এর কাছে একটি মোকদ্দমা নিয়ে এলো। তন্মধ্যে একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্যে কুরআনের বিধান মতো ফয়সালা করুন। অপরজন ছিল বুদ্ধিমান। সে বললো, হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল, আপনি কিতাবুল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমাদের ফয়সালা করবেন কিন্তু অবস্থাটা তুলে ধরার জন্যে আমাকে অনুমতি দিন। রসূল স. বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তোমার বক্তব্য পেশ করো।'

লোকটি বললো, আমার ছেলে তার ওখানে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। সে আমাকে বললো, আমার ছেলেকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তখন আমি ফিদিয়া স্বরূপ তাকে একটি দাসী ও একশ ছাগল দিয়েছি। এরপর অভিজ্ঞ লোকদের জিজ্ঞেস করায় তারা আমাকে জানালো, 'তোমার ছেলেকে একশ দুররা মারা হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে আর তার স্ত্রীকে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে।'

এ কথা শুনে রসূল স. বলেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, আমি আল্লাহর বিধান মতোই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবো। তোমার বাঁদী ও তোমার শত ছাগল ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশো দুররা মারা হবে ও এক বছরের জন্যে দেশান্তরের শাস্তি দেয়া হবে।' অতপর রসূল স. সেই ব্যক্তির ছেলেকে একশ দুররা লাগালেন এবং এক বছরের জন্যে দেশান্তর করলেন। সেই সাথে রসূল স. উনাইস সালামীকে রা. নির্দেশ দিলেন, তুমি ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গিয়ে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, সে যদি অপরাধ স্বীকার করে নেয় তাহলে তাকে রজম করে দিয়ো। অতপর উনাইস সালামী সেই লোকের স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে মহিলা ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলো অতপর রজম তথা প্রস্তরাঘাতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল। ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে কিতাবুল হুদুদ এবং কিতাবুল আহকামে বিভিন্ন সনদে এই রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন। ইমাম মুসলিম কিতাবুল হুদুদে এ রেওয়ায়েত নকল করেছেন। আবু দাউদ, ইবনু মাজা, নাসাঈ ও তিরমিযীও নিজ নিজ মুসনাদে এই রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন।

ব্যভিচারী ছেলেকে একশ দুররা ও এক বছরের দেশান্তরের শাস্তি দেয়া হয়েছিল ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করার জন্যে, অন্যথায় শুধু পিতার স্বীকৃতিতে ছেলের ওপর হদ প্রয়োগের সুযোগ ছিল না।

রসূল স.-এর কথা 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহর বিধান মতো ফয়সালা করব।' এক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ অর্থ কুরআন মাজীদ নয়।

কেননা, কুরআন মাজীদে রজমের হুকুম যেমন নেই তদ্রূপ দেশান্তরের নির্দেশও নেই। এ কথার অর্থ ছিল আল্লাহর সেই ফয়সালা যা তিনি তাঁর নবীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। কেননা নবী নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কথাই বলতেন না। কুরআন কারীমেই ঘোষিত হয়েছে– 'এবং সে মনগড়া কথা বলে না, তা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।' (সূরা নাজম- ৩-৪)

কোন কোন আলেম বলেছেন, কিতাবুল্লাহ বলার দ্বারা রসূল স.-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরআন মাজীদের ঐ আয়াত যার তিলাওয়াত (মনসুখ) রহিত হয়ে গেছে বটে কিন্তু তার হুকুম বহাল রয়েছে। সেই আয়াতটি হলো, "বয়স্ক পুরুষ (বিবাহিত) আর বয়স্কা (বিবাহিতা) মহিলা যদি ব্যভিচার করে তবে তাদের উভয়কেই রজম করা হবে।" যারা এই আয়াতের কথা বলেন, তাদের মতামত খুবই দুর্বল, কারণ তাদের মত মেনে নিলেও সেখানে দেশান্তরের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। অথচ রসূল স. সেই ছেলেকে এক বছরের জন্যে দেশান্তরের শাস্তি দিয়েছিলেন। জমহুরে শারেহীনে হাদীসের কাছে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই বেশি বিশুদ্ধ।

উনাইস : বিখ্যাত সাহাবী উনাইস বিন দিহাক আসলামী। যারা মনে করেছেন সেই সাহাবী ছিলেন আনাস বিন মালিক তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। কেননা তখন হযরত আনাস বিন মালিকের বয়স এতো কম ছিল যে, তাকে রজমের মতো নির্দেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়া সম্ভব ছিল না।

চতুর্থ উদাহরণ : মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক-এ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 'এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিল, সেই সাথে তার কোলের শিশুকে ছিনিয়ে নিতে চাইল। মহিলা রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, 'এই শিশুকে আমি পেটে ধারণ করেছি, সে আমার বুকের দুধ খেয়েছে, আমার কোল তার আরামের আধার কিন্তু এখন এই লোক আমার কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তখন রসূল স. বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি পুনরায় বিয়ে করছো ততক্ষণ তুমিই এই শিশুর অগ্রাধিকার পাবে।'

এ হাদীসের সনদে মুছান্না বিন সাবাহ নামক রাবী খুবই দুর্বল। ইমাম নাসাঈ'র মতে এই রাবী প্রত্যাখ্যান যোগ্য। কিন্তু মুছান্না সূত্র ছাড়াও অপর দুটি সূত্রেও এ হাদীস সংকলিত হয়েছে। মুসনাদে ইমাম আহমদ-এ ইবনে জুরাইজ থেকে এবং আবু দাউদ ও মুসতাদরাকে হাকেম-এ ইমাম আউযাঈ থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা উভয়েই (ইবনে জুরাইজ ও আউযাঈ) আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা থেকে শুয়াইবের পিতা তার দাদা থেকে এবং তার দাদা রসূল স. থেকে এ রেওয়ায়েত নকল করেছেন। হাকেম বলেছেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ। হাফেয যাহবীও হাকেমের মতকে সমর্থন করেছেন। আমর ইবনে শুআইব এর সূত্রে এই হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও এই সনদের বরাতেই দ্বিতীয় বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার শিশু লালন পালনের অগ্রাধিকার প্রাপ্তি ও দ্বিতীয় বিয়ের পর অধিকার হারানোর দলীল স্বরূপ এটাকেই সবাই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিখ্যাত চার ইমামের মতামতও তাই। এ কথাই হাফেয ইবনে কাইয়্যেম তাঁর প্রণীত কিতাব 'যাদুল মাআ'দ' এ বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমর রা. তাঁর এক স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর হযরত আবু বকর রা. অনুরূপ ফয়সালা দেন। হযরত আবু বকর রা. বলেন, সে (শিশুর মা) শিশুর পিতা থেকে শিশুর প্রতি বেশি স্নেহপরায়ণ, দয়াবান ও মমতাময়ী। তার দ্বিতীয় বিয়ে করার পূর্ব পর্যন্ত শিশু লালন পালনের ব্যাপারে সেই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। এ বর্ণনাটি আব্দুর রায্যাক ছওরী থেকে, ছওরী আসেম থেকে এবং আসেম ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ, ইবনু মাজা ও নাসাই শরীফে একটি রেওয়ায়েত এও রয়েছে যে, সেই মহিলা বললো, 'আমার এই স্বামী (যে তালাক দিয়েছে) আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিতে চায়? অথচ আমার ছেলে আবু আম্বার কুয়া থেকে পানি এনে আমার উপকার করে।' তখন রসূল স. ছেলেটির উদ্দেশে বল্লেন, "সে তোমার পিতা আর সে তোমার মাতা। তুমি যার ইচ্ছা তার হাত ধরতে পার। অত:পর ছেলে তার মায়ের হাত ধরলে মহিলা ছেলেকে নিয়ে চলে গেল।' উল্লেখিত

রেওয়ায়েতের সনদ সহীহ। দৃশ্যত যদিও উল্লেখিত রেওয়ায়েত দু'টির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় এবং বাস্তবেও রেওয়ায়েত দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত।

পঞ্চম উদাহরণ : সহীহ বুখারী কিতাবুল মাগাযীতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. যখন (হুদায়বিয়া চুক্তির সময়ের) অনাদায়ী ওমরা আদায় করলেন এবং মক্কায় অবস্থানের নির্ধারিত দিন অতিবাহিত করলেন, তখন মক্কার অধিবাসীরা হযরত আলী রা.-এর কাছে গিয়ে বললো, 'আপনার সাথীকে বলুন তিনি যেন মক্কা ত্যাগ করেন।'

রসূল স. মক্কা থেকে রওয়ানা হলে হামযার এক ছোট্ট মেয়ে চাচা চাচা করে চিৎকার করে তাদের দিকে অগ্রসর হলো। হযরত আলী রা. মেয়েটির হাত ধরে হযরত ফাতিমা রা.-এর উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই নাও চাচার মেয়েকে।' তখন এই মেয়েটির অধিকার নিয়ে হযরত আলী, তার ভাই হযরত জাফর এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হল। হযরত আলী তাদের উদ্দেশে বললেন, এ আমার চাচার মেয়ে। আর সবার আগে আমিই ওর হাত ধরেছি, তাই আমিই এর অভিভাবকত্বের জন্যে অগ্রাধিকার পাবো। হযরত জাফর বললেন, এ আমার চাচার মেয়ে, তাছাড়া ওর খালা আমার স্ত্রী। হযরত যায়েদ বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। সব শুনে রসূল স. মেয়েটির খালার পক্ষে ফয়সালা দিলেন। বললেন, 'আল-খালাতু বি-মানযিলাতিল উম্মি' ' খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।' সেই সাথে হযরত আলীর উদ্দেশে বললেন, 'আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনকা' 'তুমি আমার আর আমি তোমার', হযরত জাফরকে বললেন, 'তুমি দেখতে আমার মতো এবং তোমার স্বভাবও আমার মতো।' হযরত যায়েদকে বললেন, 'তুমি আমার ভাই ও সঙ্গী।' হযরত হামযার সেই মেয়েটির নাম ছিল হামারা অথবা উমামা, উম্মুল ফযল উপনামেই সে ছিল প্রসিদ্ধ। 'খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়' এ বাক্যের মর্মকথা হলো, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত হয় কিন্তু উত্তরাধিকারের বেলায় নয়।' তুমি আমার অংশ এবং আমি তোমার অংশ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, স্বীয় কন্যার স্বামী হওয়ার দিক থেকে, চাচাতো ভাই হওয়ার দিক থেকে এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার দিক থেকে সর্বোপরি নবীর সাথে গভীর সম্পর্কের দিক থেকে আমরা পরস্পরের সাথে যুক্ত। শুধু চাচাতো ভাই হিসেবে হযরত আলীকে একথা বলা হয়নি। তাই যদি হবে তাহলে তো জাফরও ছিলেন চাচাতো ভাই কিন্তু তার ক্ষেত্রে রসূল স. এ বাক্য প্রয়োগ করেননি। হাফেয ইবনে হাজার এ ব্যাখা দিয়েছেন।

উপরে আমরা নবী করীম স.-এর ফয়সালার কয়েকটি নমুনা পেশ করলাম। উলামায়ে কেরাম নবীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিস সংকলন একত্রিকরণ ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ে যতোটা গুরুত্ব ও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন, রসূল স.-এর ফয়সালাগুলোকে একত্রিকরণ ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে শায়খ যহীরুদ্দীন আলমুরগনানী হানাফী (মৃত্যু ৫০১ হিঃ) র. এবং ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল ফরজ আত্‌তুল্লা' আলকুরতবী আল আন্দালুসী র. (মৃত্যু ৪৯৭ হিঃ) এই দুই মনীষী ছাড়া তেমন কেউ এ ক্ষেত্রে সাধনা করেননি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে ইবনে তুল্লা'র কিতাবটি অক্ষুণ্ন থাকে। বক্ষমান নিবন্ধটি সেটিরই বাংলা ভাষান্তর। চলবে

তথ্যপঞ্জি :

১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা-৩৫২
২. ইসতিলাহাতুল উলূমুল ইসলামিয়া খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা-১২৩৪
৩. আল মাবসূত, ১২ ঃ ৮৫
৪. সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-২৮ কিতাবুত তালাক।
৫. সুনানে ইবনু মাজা, কিতাবুল আহকাম, বাবু কাযাউ বিল কোড়া।
৬. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফারায়েয।
৭. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আকযিয়া।
৮. সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাত, সহীহ মুসলিম কিতাবুল আকযিয়া।

অনুবাদ : আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ১৯-৪০

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ঘুষ

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

ইসলামী আইনে ঘুষের সংগা

ইসলামী আইনবিগগণ বিভিন্নভাবে ঘুষের সংগা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সংগা হলো- 'নিজের পক্ষে রায় প্রদানের জন্য কিংবা কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিচারপতি বা অন্য কাউকে যে অর্থ বা সম্পদ প্রদান করা হয়, কিংবা যে উপকার পৌছানো হয়, তাকে বলা হয় ঘুষ'[১]।

এখানে লক্ষণীয়, 'অন্য কাউকে' কথাটি দ্বারা এমন সব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে ঘুষদাতা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঘুষ প্রদান করে থাকে। এসব ঘুষখোর ব্যক্তি হতে পারে সরকারের প্রশাসনিক কোন কর্তা ব্যক্তি বা কর্মচারী কিংবা বেসরকারি কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা কোম্পানির এজেন্ট কিংবা ভূপতি। এমন কি সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার প্রশাসনিক কর্তা ও কর্মচারীও এতে শামিল হতে পারে।

আরো লক্ষ করলে বুঝা যাবে, 'নিজের পক্ষে রায় প্রদানের জন্য কিংবা কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে' কথাটি দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সে রায় প্রদান ও স্বার্থ হাসিল ন্যায় পন্থায়ই হোক কিংবা অন্যায়ভাবেই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই প্রদত্ত অর্থ ঘুষ বলে পরিগণিত হবে।

এছাড়া 'যে অর্থ বা সম্পদ প্রদান করা হয় কিংবা উপকার পৌছানো হয়' কথাটি দ্বারা বুঝা যায় শুধু টাকাই ঘুষের মধ্যে পরিগণিত হয় না, বরং সকল প্রকার সম্পদ ও অন্যবিধ প্রকারের আদান-প্রদানও ঘুষের মধ্যে গণ্য হতে পারে।

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ঘুষ

ইসলাম মানুষের অর্থসম্পদ সংরক্ষণসহ অবৈধভাবে যাতে তা কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। এজন্য সবধরনের অবৈধ পন্থা ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যের মাল আত্মসাৎ করার জন্য ঘুষ হচ্ছে এমনি একটি অবৈধ পন্থা যার প্রসারে সমাজ অচিরেই জুলুম, নির্যাতন, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতিতে ভরে ওঠে। আর তাই ইসলাম ঘুষ দেয়াকে যেমন হারাম সাব্যস্ত করেছে, তেমনি ঘুষ গ্রহণকেও হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।

ঘুষ প্রদানের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ রেখে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ একে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিচে আমরা সেই প্রকারগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি দলীলসহ সেগুলোর হুকুম সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করব।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ক. ন্যায়কে অন্যায় ও অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করার জন্য ঘুষ প্রদান

এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামে হালাল যেমন সুস্পষ্ট, হারামও তেমন সুস্পষ্ট। সমাজে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যা ও অন্যায়ের বিতাড়নই ইসলামের লক্ষ। ঘুষ যেহেতু হককে বাতিল ও বাতিলকে হক প্রতিপন্নকারী পথগুলোর অন্যতম তাই ইসলাম একেও সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে এবং একদিকে ঘুষ গ্রহীতাকে যেমন অপরাধী ও পাপী সাব্যস্ত করেছে, অন্যদিকে তেমনি ঘুষদাতা ও মধ্যস্থতাকারীকেও পাপী বলে ঘোষণা করেছে।

সাধারণত দেখা যায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান বিচারালয়ে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি হয়ে থাকে প্রশাসনিক অফিস আদালতে। কারণ অপরাধীচক্র নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য কিংবা স্বীয় স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্যের ন্যায্য অধিকার বানচাল করার জন্য বিচারক বা কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করে থাকে।

ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের অবৈধ স্বার্থ অর্জনের জন্যও তারা ঘুষ প্রদান করে থাকে। অবৈধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে বিচারক বা অফিসের কর্মকর্তা ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন তাদের মধ্যে দুটো অপরাধ লক্ষণীয় ঃ

১. অন্যায় কাজে সাহায্যের বিনিময়ে ঘুষ তথা অর্থ গ্রহণ করা। আর অন্যায় কাজে সাহায্য করা যেমন অপরাধ ও হারাম, তেমনি বিনিময়ে অর্থ গ্রহণও অপরাধ এবং হারাম।

২. অন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা। নিসন্দেহে এটি হারাম এবং এ কাজ যিনি করেন তিনি সুস্পষ্টভাবে পাপাচারী ও ফাসিক।

সুতরাং এ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধী ব্যক্তি বিচারক বা কর্মকর্তা যেই হোন না কেন, তিনি পদচ্যুত ও বরখাস্ত হওয়ার সাথে সাথে ঘুষ গ্রহণের অপরাধে অন্য শাস্তি পাওয়ারও উপযুক্ত হয়ে পড়েন।

ঘুষ গ্রহীতার ন্যায় ঘুষদাতাও এতে দুটো অপরাধে অভিযুক্ত ঃ

১. অন্যায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ঘুষ প্রদান।

২. অবৈধভাবে স্বার্থসিদ্ধির ফলে নিজের প্রতি এবং বিশেষত অন্যের অধিকারের প্রতি জুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ানো।

মুসলিম আইনজ্ঞদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এ ধরনের ঘুষ প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই সুস্পষ্টভাবে হারাম, চাই তা শাসনকর্তার ক্ষেত্রে হোক কিংবা বিচারক বা কর্মচারী অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হোক।

উপরোক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে নিম্নলিখিত দলীল রয়েছে।

আল-কুরআন

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ 'আর তোমরা পারস্পরিক ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না এবং শাসকদের সম্মুখে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করতে পারবে।[২]

আল হাদীস

এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। আমরা নিচে প্রধান কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করব।

আবু হুরায়রা রা. হতে এবং ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'শাসনকার্যে ঘুষদাতা ও গ্রহীতাকে আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন।'[৩]

সওবান রা. বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা ও উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।[৪]

লা'নত বা অভিসম্পাত হচ্ছে আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে দূরে নিক্ষেপ করা। আর বড় ধরনের হারাম ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হলেই শুধু লা'নত করা হয়।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'নিকৃষ্ট ও মন্দ উপার্জনে যে দেহ গড়ে উঠবে, জাহান্নামই হবে তার উৎকৃষ্ট স্থান'। প্রশ্ন করা হলো- নিকৃষ্ট ও মন্দ উপার্জন কি? উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ঘুষ।'[৫]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করবে, তার ও বেহেশতের মাঝে সেই ঘুষ বাধা হয়ে থাকবে।'

আবদুর রহমান বিন আওফ রা. বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ ঘুষখোর ও ঘুষদাতার ওপর লা'নত বর্ষণ করেছেন।'[৬]

উমর রা. সা'দ বিন্ আবী ওয়াক্কাস রা.-এর কাছে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেন, 'আল্লাহর দীনে কোন ঘুষ নেই।'

ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : 'প্রশাসনিক কার্যে ঘুষ গ্রহণ কুফরীর সমতুল্য এবং মানুষের অন্যান্য কার্যে তা হারাম ও নিকৃষ্ট উপার্জন রূপে স্বীকৃত।'[৭]

এছাড়া সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে এ রকম আরো বহু উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখিত কুরআনের আয়াত, হাদীসসমূহ এবং সাহাবাদের উক্তি থেকে সুস্পষ্টরূপে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঘুষের যাবতীয় আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হারাম এবং ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম ও নিকৃষ্ট উপার্জন।

খ. স্বীয় প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য কিংবা অত্যাচার ও ক্ষতি এড়ানোর জন্য ঘুষ প্রদান

মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। তাই সমাজের অপরাপর সভ্যের সাথে তার দৈনন্দিন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার মাধ্যমে তারা পারস্পরিক স্বার্থ বিনিময় করে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজে একের প্রতি অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ কেউ ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না। সুতরাং সমাজে সৃষ্টি হয় অবিচার-অনাচার ও দুর্নীতি, প্রসার ঘটে ন্যায়-নীতির ভারসাম্যহীনতার। সরল পথে নিজের প্রাপ্য অধিকার অর্জন হয়ে পড়ে যেমনি দুরূহ,

তেমনি দুরাচারীদের দুর্নীতির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া হয়ে পড়ে কঠিন। নিজের অধিকার লাভের জন্য কিংবা আপতিত অত্যাচার ও ক্ষতি এড়ানোর জন্য দুরাচারীদের ঘুষ প্রদান করা ছাড়া তার সামনে তখন আর কোন পথ খোলা থাকে না।

এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা তার অধিকার লাভের পথ সুগম করে দেন।

কিন্তু এজন্য ঘুষ প্রদানের নীতিতে অগ্রসর হলে কে পাপী ও গুনাহ্গার হবে ঘুষ গ্রহীতা একাই, নাকি ঘুষ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ই– সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে[৮] দুটো মত রয়েছে।

প্রথম মত ঃ ঘুষদাতা নয়, বরং ঘুষগ্রহীতা একাই পাপী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে

অধিকাংশ উলামা এমত পোষণ করেছেন[৯]। প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদ আবু লাইছ সমরকন্দী বলেন, এ থেকে আমরা ধরে নেই যে, কোন ব্যক্তি যদি নিজের জান ও মাল রক্ষার্থে একান্ত বাধ্য হয়ে ঘুষ প্রদান করে তবে সে পাপী হবে না।[১০]

নিজের হক ও অধিকার আদায় কিংবা ক্ষতি ও অত্যাচার এড়ানোর জন্য ঘুষ প্রদান করলে ঘুষদাতা পাপী না হওয়ার পক্ষে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে ইমাম ইবন হাযম বলেছেন ঃ 'যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, কেন তোমরা নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অর্থ প্রদানকে বৈধ বলে ঘোষণা করছ? অথচ আবু বকর রা. থেকে তোমরা বর্ণনা করেছ যে, এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্পদ কেড়ে নিতে উদ্যোগী হয়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে তোমার সম্পদ প্রদান করো না। সে বললো, যদি সে আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে আপনার কি মত? তিনি বললেন, তুমি তা প্রতিহত করবে। সে বললো, যদি আমাকে সে হত্যা করে? তিনি বললেন, তাহলে তুমি হবে শহীদ। সে বললো, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, তাহলে সে দোযখে যাবে। এছাড়া অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ 'ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই আল্লাহ্ লা'নত করেছেন'।

এর উত্তর হলো– অত্যধিক প্রয়োজনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যাচার ও নির্যাতন এড়ানোর জন্য অর্থ প্রদানকারী ঘুষদাতার আওতায় পড়বে না। সম্পদ রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার হাদীস সম্পর্কে আমরা বলবো, যে ব্যক্তি নিজেই অত্যাচার এড়াতে সক্ষম তার জন্য এক পয়সাও প্রদান করা বৈধ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তা এড়াতে অক্ষম সে সম্পর্কে আল্লাহই তো ফয়সালা দিয়েছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেন না'। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসম্ভব পালন করবে'। ফলে এক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার মাধ্যমে আত্মরক্ষার নির্দেশ তার উপর অপরিহার্য হবে না, বরং এক্ষেত্রে সে অর্থ প্রদানের উপর জোর পূর্বক বাধ্য ব্যক্তির আওতায় পরিগণিত হবে। ইবনে মাজা'র বর্ণনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল, বিস্মৃতি ও বাধ্যবাধকতার ফলে কৃতকার্যের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।'

সহীহ বোখারীতে আবু মূসা আশয়ারী রা. কর্তৃক অন্য একটি বর্ণনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'অভুক্তের আহার্যের যোগান দাও এবং বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর কর।' আর এ বিধানটি অন্যায়ভাবে নিগৃহীত ও নিপীড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য'।[১১]

এ মতের সপক্ষের প্রমাণাদী

প্রথমত ঘুষ গ্রহীতা পাপী হওয়ার পক্ষে প্রমাণ–

১. আল্লাহ তা'লার বাণী ঃ 'এবং পূণ্য ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর।[১২] প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং তাকে ক্ষতি ও নির্যাতন থেকে বাঁচানো আয়াতে নির্দেশিত সহযোগিতারই অন্তর্ভুক্ত। আয়াত সরাসরি সে নির্দেশই প্রদান করছে। তাই কোন প্রকার বিনিময় ছাড়াই এ ধরনের সহযোগিতা করা ওয়াজিব ও অবশ্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি এরূপ সহযোগিতার বিনিময়ে সম্পদ গ্রহণ করলে তা আয়াতের নির্দেশের পরিপন্থী হওয়ার কারণে অবৈধ গণ্য হবে। আর অবৈধভাবে ঘুষ গ্রহণের অপরাধে সে পাপী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

২. আল্লাহর বাণী ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাত করো না। তবে পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়িক আদান প্রদান হলে ভিন্ন কথা।[১৩]

অন্যের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ আয়াতে উল্লেখিত অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাতেরই অন্তর্গত, যা থেকে আয়াতটি সরাসরি নিষেধ করছে। আর নিষেধাজ্ঞা মূলত হারাম হওয়ারই ঘোষণা। অতএব, বিশেষভাবে যে সকল বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বই হচ্ছে অন্যের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে পৌছে দেয়া তাদের জন্য এ ধরনের ঘুষ হারাম।

৩. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সহযোগিতা করেন যতক্ষণ বান্দা নিজের ভাইয়ের সহযোগিতা করে।[১৪] আর অন্যের প্রাপ্য আদায়ের বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণ তাকে সহযোগিতা না করারই নামান্তর। যে অন্যকে সহযোগিতা করে না, সে আল্লাহর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়– হাদীস থেকে এটাই বুঝা যাচেছ। সুতরাং আল্লাহর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত কাজ করার কারণে সে পাপী সাব্যস্ত হবে। অতএব ঘুষ গ্রহীতা এ হাদীসের আলোকে পাপী সাব্যস্ত হবে।

৪. নবী কারীম স. বলেছেন ঃ 'নিজের মুসলিম ভাইয়ের সম্মতি ছাড়া তার সম্পদ থেকে কিছু আহরণ করা বৈধ নয়।[১৫]

বাধ্য না হলে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য অর্থ প্রদান করতে কেউ স্বতস্ফূর্তভাবে রাজী হয় না। তাই এ অর্থ গ্রহণ অবৈধ এবং হারাম।

৫. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন ঃ 'আর তোমাদের উপর রক্তপাত ও অন্যের সম্পত্তি হারাম[১৬]। হাদীসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে অন্যায়ভাবে

কোন সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। আর অন্যের প্রাপ্য আদায়ে ঘুষ গ্রহণ অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করারই শামিল। অতএব তা হারাম এবং গ্রহীতা পাপী সাব্যস্ত হবে।

৬. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'কোন মুসলমানকে জুলুম থেকে উদ্ধার করার বিনিময়ে কমবেশি যতুটুকু অর্থই কেউ গ্রহণ করে, তা হারাম ও নিকৃষ্ট উপার্জনে পরিণত হবে। এক ব্যক্তি বলল, আমাদের ধারণা ছিল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ঘুষই শুধু হারাম বলে গণ্য। ইবনে মাসউদ রা. বললেন ঃ 'সে তো কুফুরী...'।

হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলো, কাউকে নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে অর্থগ্রহণ করা নিকৃষ্ট ও হারাম উপার্জন করারই নামান্তর।

দ্বিতীয়ত অধিকার আদায়ের জন্য ঘুষ প্রদান করলে ঘুষদাতা পাপী না হওয়ার পক্ষে প্রমাণ

১. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি হাবশায় থাকা কালে একবার অবরুদ্ধ হন। অতপর দুই দিনার প্রদান করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি তখন বললেন, পাপ বর্তাবে গ্রহীতার উপর, দাতার উপর নয়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ইবনে মাসউদ রা. জুলুম এড়ানোর জন্য অর্থ প্রদান করেছেন। কেননা তার মতে এরকম পরিস্থিতিতে অর্থ প্রদানে পাপ নেই। আর সাহাবীর কাজ দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য, যখন এর বিপরীতে কোন সহীহ হাদীস না থাকে। আর যেহেতু এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদের আমলের বিপরীতে কোন হাদীস পাওয়া যায় না, তাই তার কাজই এক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গণ্য হবে।

২. আবুদর রায্যাক জাবের বিন যায়েদ ও শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, 'অত্যাচারের আশংকা দেখা দিলে নিজের জান ও মালের হেফাজত করাতে কোন দোষ নেই।'[১৭] আর হেফাজত ঘুষ প্রদানের মাধ্যমেও হতে পারে। আতা ও ইবরাহীম নাখয়ী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[১৮]

হিশাম প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ঘুষদাতা ও গ্রহীতার প্রতি রসূলের স. অভিসম্পাত শুধু বাতিলকে হক ও হককে বাতিলে পরিণত করার ক্ষেত্রে। অন্যথায় সম্পদ ও অধিকার রক্ষায় কিছু প্রদান করাতে কোন দোষ নেই।[১৯]

হাসান থেকে ইউনুস আরো বর্ণনা করেন, কেউ যদি তার ইজ্জত সম্মান রক্ষার্থে নিজের মাল থেকে কিছু প্রদান করে তবে তাতে কোন দোষ নেই।

তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত উক্তিসমূহ এ কথারই প্রমাণ বহন করছে যে, উপরোক্ত অবস্থায় ঘুষ প্রদান করতে বাধ্য হলে ঘুষদাতা পাপ ও অপরাধ হতে মুক্ত থাকবে।

দ্বিতীয় মত ঃ ঘুষদান ও গ্রহণ উভয়ই সমানভাবে হারাম

সুতরাং দাতা ও গ্রহীতা দু'জনই সমানভাবে পাপী। এ মতের সপক্ষের প্রমাণাদী ঃ

ঘুষগ্রহণ হারাম হওয়ার পক্ষের দলীলগুলো ইতোপূর্বে প্রথমোক্ত মতের প্রমাণাদী বর্ণনার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০]

এখন উপরোক্ত অবস্থায় ঘুষ দেয়াও যে হারাম দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাগণ তার নিম্নলিখিত প্রমাণ পেশ করেছেন।[২১]

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ তা'আলা ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।

হাদীসটি অভিসম্পাত বর্ষণে সবধরনের ঘুষদাতাকেই শামিল করছে– নিজের প্রাপ্য আদায় কিংবা জুলুম ও ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে হোক, কিংবা হককে বাতিল বা বাতিলকে হকে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই হোক।

২. শরীয়ত সমর্থিত কোন অধিকার ছাড়া এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম। কেননা আল্লাহ বলেছেন : 'তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না।[২২] আর ঘুষ গ্রহীতাকে উপরোক্ত অবস্থায় সম্পদ প্রদানের মানে দাঁড়ায় তাকে বাতিল ও অন্যায় পন্থায় সম্পদ গ্রাসে সাহায্য করা। আর বাতিলের কাজে সাহায্য করা হারাম। সুতরাং ঘুষদাতার জন্যও এক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান করা হারাম বলে গণ্য হবে।

উল্লেখিত মত দুটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং কুরআন হাদীসে উল্লেখিত প্রমাণসমূহ সূচারুরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রাপ্য অধিকার আদায় কিংবা জুলুম নির্যাতন এড়ানোর ক্ষেত্রে ঘুষদাতা নয়, গ্রহীতাই শুধু পাপী হবে– এই মর্মে প্রথমোক্ত মতটির বক্তব্যই অধিক গ্রহণযোগ্য এবং তা নিম্নলিখিত কারণে :

১. ঘুষ প্রদান হারাম হওয়ার দলীল আ'ম ও ব্যাপকা অর্থবোধক। যেমন : 'আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে লানত করেছেন'-এ হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক– যা ঘুষের সব ধরনের আদান-প্রদান হারাম হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। অন্যদিকে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায় কিংবা অত্যাচার ও ক্ষতি এড়ানোর জন্য একান্ত বাধ্য হয়ে ঘুষ প্রদান হারামের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ার পক্ষের দলীলসমূহ খাস ও সুনির্দিষ্ট, যা উল্লেখিত অবস্থায়ই শুধু ঘুষ প্রদান করলে ঘুষদাতা পাপী না হবার ইঙ্গিত বহন করছে। এমতাবস্থায় ইসলামী আইনবিদগণের মতে যে ক্ষেত্রে খাস দলীল আরোপিত হয় সেক্ষেত্রে খাস দলীল মোতাবেক আমল করা হবে। এছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে আ'ম দলীল মোতাবেক আমল বহাল থাকবে।[২৩]

২. যে অবস্থায় ঘুষ প্রদান হারামের পর্যায়ভুক্ত নয় বলা হয়েছে, সেটি এমনই একটি জরুরী অবস্থা যে, অধিকার হারানোর বেদনায় এবং অত্যাচার ও ক্ষতির আশংকায় ভুক্তভোগীর সীমাহীন ধৈর্যচ্যুতি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে তার সামনে ঘুষ প্রদান ছাড়া অন্য কোন পথই খোলা থাকবে না। এহেন ক্ষেত্রে একটি শরয়ী বিধিও রয়েছে : 'প্রয়োজন নিষিদ্ধকে জায়েযে পরিণত করে।[২৪] সুতরাং এ জরুরী অবস্থায় ঘুষ প্রদান জায়েয হবে, যদিও ঘুষ গ্রহীতা পাপাচারী বলে সাব্যস্ত হবে।'

৩. ঘুষ নেয়ার জন্য ঘুষ গ্রহীতা, বিভিন্ন বাহানা তৈরি করে মূলত ঘুষদাতাকে ব্লাকমেইল করেন। এ রকম পরিস্থিতিতে ঘুষগ্রহীতার অবস্থা ছিনতাইকারীর ন্যায় যে ভয় দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে

এবং ঘুষদাতার অবস্থা ছিনতাইয়ের শিকার ব্যক্তির ন্যায়, যে ভীত হয়ে জান ও মাল বাঁচানোর জন্য কিছু সম্পদ ছিনতাইকারীকে দিয়ে দেয়।

গ. কোন পদবী বা চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান

রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব এমন সব লোকের হাতে অর্পণ করা উচিত যারা হবেন যোগ্য, বিশ্বস্ত, স্থিতিশীল এবং মর্যাদাসম্পন্ন। এটি আমাদের সুমহান শরীয়ত কর্তৃক আমাদের উপর আরোপিত দীনী কর্তব্য তথা ওয়াজিব রূপে পরিগণিত। যাতে করে অন্যায়, অসত্য ও জুলুম নির্যাতনের সবগুলো পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়। ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে, ঘুষ প্রদান এমন সব অন্যায় ও মন্দ পথসমূহের অন্যতম যদ্বারা কোন পদবী কিংবা চাকরি লাভের চেষ্টা করতেও দেখা যায়। এজন্যই এতদুদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান, ঘুষ গ্রহণ এবং উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকরণকে ইসলাম সুস্পষ্ট হারাম বলে ঘোষণা করেছে- চাই তা ছোট কিংবা বড় যে কোন পদবী লাভের উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। আর এটা নিসন্দেহ যে, এক্ষেত্রে পদবীর গুরুত্ব যত বেশি হবে, পাপের মাত্রাও তত বেড়ে যাবে।[২৫]

এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে অসংখ্য প্রমাণাদি বর্তমান। তন্মধ্যে নিচে কয়েকটি বর্ণনা করা হলো ঃ

১. আল্লাহর বাণী ঃ 'আল্লাহ তোমাদের এই নির্দেশই প্রদান করছেন যে, যাবতীয় আমানত তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দাও এবং লোকদের মধ্যে যখন বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে...'।[২৬]

ঘুষ আদান-প্রদানের মাধ্যমে কোন পদবী বা চাকরি দেয়ার অর্থ হলো আমানতকে এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা যার প্রকৃত অধিকারী সে নয়। সুতরাং এতে আল্লাহর নির্দেশের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা হচ্ছে। তাই এতদুদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান ও গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম।

২. আল্লাহর বাণী ঃ 'হে ঈমানদারগণ! জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। আর নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রশ্রয় দিও না।'[২৭]

পদোন্নতি ও চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালনে খেয়ানতেরই নামান্তর। কেননা এর ফলে ঘুষ গ্রহীতা চাকরির পদটিকে অযোগ্য ব্যক্তির (ঘুষ দাতার) হাতে অর্পণ করে। তাই তা সম্পূর্ণ হারাম।

৩. ইবনে আদী, উকাইলী ও হাকেম বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কাউকে কোন কাজে নিযুক্ত করল, অথচ প্রজাদের মধ্যে সে কাজের জন্য তার চেয়েও অধিক উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়, তাহলে নিয়োগকারী আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সমস্ত মুসলমানের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করল।'[২৮]

অনুরূপভাবে আবু ইয়া'লা হোযায়ফা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি কোন ব্যক্তি কাউকে দশজনের উপর দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ করে

এ কথা জেনেও যে, উক্ত দশজনের মধ্যে নিয়োগকৃত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ব্যক্তি রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ, তার রসূল এবং সমস্ত মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করল।[২৯]

হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে- যোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পণ না করা আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে প্রতারণা করার শামিল। আর পদমর্যাদা ও চাকরি লাভের আশায় ঘুষের আদান প্রদান অযোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পণের সহায়ক।

৪. মা'কাল বিন ইয়াসার বর্ণনা করেন, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'মুসলমান প্রজাদের অধিপতি যে মুসলিম শাসনকর্তা তাদের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন।[৩০]

ঘুষের মাধ্যমে অযোগ্য লোকের হাতে ক্ষমতা অর্পণ জাতির সাথে প্রতারণা করার শামিল। সুতরাং এতদুদ্দেশ্যে ঘুষের আদান-প্রদানকারীর ওপর হাদীসের বক্তব্য পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ ছাড়া আরো অনেক হাদীস পাওয়া যায় যা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন সরকারি বা বেসরকারি চাকরি কিংবা পদমর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান সম্পূর্ণরূপে হারাম।

যা সরাসরি ঘুষ নয়, তবে ঘুষের সাথে সংশ্লিষ্ট

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ঘুষ নামক অপরাধের সাথে যাতে জড়িত হতে না হয় সেজন্যে অনেকেই উপহার-উপঢৌকন প্রদানের ন্যায় চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

অনেকে আবার আরো সূক্ষ্ম চাতুরীর আশ্রয় নেন। ঘুষ ও উপঢৌকন কোনটাই না দিয়ে তারা ঘুষ গ্রহীতার স্বার্থ রক্ষা ও তাকে অর্থ ছাড়া অন্য ধরনের সেবা প্রদানের আশ্রয় নেন। এক্ষেত্রে অনেককে তদবীর ও মিডিয়ার আশ্রয় নিতেও দেখা যায়। মোট কথা, এ তিনটি পদ্ধতি সরাসরি ঘুষ বলে পরিচিত নয় এবং মূলত এ পদ্ধতিগুলো জায়েয বলেই সমাজে স্বীকৃত-সেজন্য অনেককেই ঘুষের পরিবর্তে এ ধরনের বিনিময় পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ফলে ঘুষ নামক মহা অপরাধে লিপ্ত হননি বলে তিনি নিজে যেমন বিরাট আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, তেমনি সামাজিকভাবে তাঁর উপর ঘুষ দেয়ার অপবাদ আরোপ করা থেকেও তিনি বেঁচে যান।

আমরা নিচে আলোচনা করবো কখন এগুলো প্রশংসনীয় বলে স্বীকৃত হবে এবং কখন ঘুষ বলে চিহ্নিত হবে।

প্রথমত উপহার-উপঢৌকন

আরবীতে একেই বলা হয় হাদীয়া। ইসলামী আইনবিদগণ হাদীয়ার সংগা দিয়েছেন- 'কাউকে শর্তহীনভাবে কোন অর্থ সম্পদ-প্রদান করা'[৩১]। লক্ষ করার বিষয় যে, 'শর্তহীনভাবে' কথাটি দ্বারা ঘুষ ও হাদীয়ার মধ্যে বিভেদরেখা টেনে দেয়া হয়েছে।

উপহার-উপঢৌকন কখন ঘুষ হিসেবে চিহ্নিত হবে?

হাদীয়া বা উপহার দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি উত্তম কাজ বলে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যেমন ঃ

১. হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাদীয়ার আদান-প্রদান কর, তাহলে একের প্রতি অন্যের ভালবাসা সৃষ্টি হবে।'

২. ইবনে আসাকের আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'হাদীয়ার আদান-প্রদান কর। তাহলে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং মোসাফাহা কর, তাহলে তোমাদের থেকে শত্রুতা ও হিংসা দূরীভূত হবে।

৩. আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা পরস্পর হাদীয়া আদান-প্রদান কর। কেননা তা হৃদয়ের কলুষতা ও বিদ্বেষ দূর করে। আর কোন প্রতিবেশিনী তার প্রতিবেশিনীকে ছাগলের খুরের একাংশের ন্যায় সামান্য উপহার দিতেও যেন কুণ্ঠাবোধ না করে।[৩২]

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে হাদীয়া দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশ সাধারণত ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় কাজ সম্পর্কে দেয়া হলেও এ বিষয়ে এজমা[৩৩] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হাদীয়া ওয়াজিব নয়।[৩৪]

সুতরাং হাদীস দ্বারা হাদীয়া মানদুব[৩৫] বা উত্তম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তেমনিভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, যে হাদীয়া গ্রহণ করাও উত্তম। কেননা হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে, এর মাধ্যমে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধন দৃঢ় হয়। তবে হাদীয়া আদান-প্রদানের এ প্রতিবিধান ঐ সমস্ত লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা সরকারি কিংবা বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা কর্মচারীরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু যারা সরকারি বা বেসরকারি কোন কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন– যেমন বিচারক, শাসকবর্গ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের উচিত হাদীয়া গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে তারা যদি এমন হয়ে থাকেন যে, নিয়োগপ্রাপ্তির পূর্বে তাদেরকে হাদীয়া দেয়া হত না। তবে এমতাবস্থায় নিয়োগের পরে প্রদত্ত হাদীয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা এক্ষেত্রে হাদীয়া প্রদান উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফলে যে কাজ হাদীয়া ছাড়াই করে দেয়া উচিত ছিল, তা এখন হাদীয়ার বিনিময়ে করে দেয়া হচ্ছে এবং এভাবেই তা এক প্রকার ঘুষে পরিণত হচ্ছে।

ইবনুত্ তীন বলেছেন, 'কর্মচারীদের প্রতি প্রদত্ত উপঢৌকন হাদীয়া নয়, বরং ঘুষ বলেই গণ্য হবে। কেননা উক্ত কর্মে নিয়োজিত না থাকলে তাকে এ উপঢৌকন দেয়া হত না। আর বিচারকের প্রতি প্রদত্ত হাদীয়া নিকৃষ্ট ও হারাম উপার্জন বলে স্বীকৃত......।'[৩৬]

রাবীয়া বলেন, 'হাদীয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা ঘুষ আদান-প্রদানের মাধ্যম।'[৩৭]

অতএব দেখা যাচ্ছে- এক্ষেত্রে হাদীয়া হারাম ও ঘুষ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। তবে উপরোক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কাজের প্রকৃতিভেদে তাদেরকে দেয়া হাদীয়াও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আমরা তাই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের প্রতি প্রদত্ত উপঢৌকন কখন ঘুষ বলে গণ্য হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করব।

১. ইমাম (ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক) : ফাতওয়া হিন্দিয়া গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতাকে হাদীয়া প্রদান জায়েয বলা হয়েছে।[৩৮] তবে ইবনে আবেদীন এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য হাদীয়া গ্রহণ বৈধ নয়। তবে জামে মসজিদের ইমাম হাদীয়া গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু ইমাম যদি শাসনকর্তার অর্থে ধরে নেয়া হয়, তাহলে হাদীয়া গ্রহণ তার জন্য অবৈধ। কেননা তিনিই হচ্ছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথা সমস্ত রাষ্ট্রের নেতা। তিনি সবার জন্য আদর্শ স্বরূপ। তাই হাদীয়া গ্রহণ তার জন্য হারাম ঐ কারণে যা ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'ইমাম তথা রাষ্ট্রনায়ককে প্রদত্ত হাদীয়া গনীমত আত্মসাতের মত।'[৩৯]

ইবনে আসাকের আবদুল্লাহ বিন সা'দরা. থেকে বর্ণনা করেন : 'সুলতান তথা রাষ্ট্রনেতাকে প্রদত্ত হাদীয়া হারাম উপার্জন ও আত্মসাতকৃত সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

ইবনে জারীর জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আমীর-ওমরাহদেরকে দেয়া হাদীয়া আত্মসাতকৃত সম্পদের অন্তর্গত।

হাদীসগুলো দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হচ্ছে রাষ্ট্রনেতার হাদীয়া গ্রহণ গনীমতের মাল আত্মসাতের সমতুল্য। আর গনীমতের মাল আত্মসাত করা সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম। অতএব শাসকবর্গের হাদীয়া গ্রহণও হারাম।

তবে হাদীয়া প্রদান যদি কোন পদবী লাভ কিংবা প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত কোন স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্তে না হয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রীয় নেতার জন্য তা গ্রহণ বৈধ হবে।[৪০] কেননা হাদীয়া গ্রহণ যে কারণে হারাম হয়েছে, সে কারণ অনুপস্থিত থাকলে তা জায়েয বলে সাব্যস্ত হবে। ইবনুত তীনের পূর্বের উক্তি দ্বারাও সেটাই বুঝা যাচ্ছে। এছাড়া উমর ইবনে আবদুল আজীজকে হাদীয়া দেয়া হলে তিনি তা ফেরত দেন এবং 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীয়া গ্রহণ করতেন' এ প্রশ্ন তাকে করা হলে তিনি বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত উপঢৌকন তাঁর জন্য হাদীয়াই ছিল; কিন্তু আমাদের জন্য তা হবে ঘুষ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীয়া দেয়ার মাধ্যমে হাদীয়া প্রদানকারী তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতেন তাঁর নবুওয়াতের কারণে, প্রশাসনিক কোন উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু আমাদেরকে হাদীয়া প্রদান করা হয় প্রশাসনিক কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য'।[৪১]

সুতরাং হাদীয়ার বিনিময়ে প্রশাসনিক কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই এক্ষেত্রে তা হারাম হওয়ার একমাত্র কারণ। অন্যথায় তা জায়েয বলেই গণ্য হবে।

২. **বিচারক ঃ** যে সব ক্ষেত্রে হাদীয়া গ্রহণের ফলে বিচারকের উপর ঘুষ গ্রহণের অপবাদ আরোপিত হয়, সে ক্ষেত্রে হাদীয়া গ্রহণ তার জন্য অবৈধ। নিম্নলিখিত অবস্থায় এ ধরনের অপবাদ আরোপিত হয়ঃ

ক. আসামী কিংবা ফরিয়াদী কর্তৃক প্রদত্ত হাদীয়া, চাই তারা উক্ত বিচার কার্যে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই বিচারককে হাদীয়া প্রদানে অভ্যস্ত থাকুক বা না থাকুক, আর বিচারকও তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।

খ. আসামী ও ফরিয়াদী ছাড়া অন্য এমন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাদীয়া গ্রহণ যার সাথে বিচার কার্যে নিয়োগের পূর্বে বিচারকের হাদীয়া আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল না। এতে ঘুষের অপবাদ এজন্য যে, হাদীয়া প্রদানের কারণে বিচারক তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে। এছাড়া হাদীয়া দেয়ার ফলে বিচারকের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলে জনসাধারণের মধ্যে সে নিজেকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করবে। ফলে বিচারক থেকে ভবিষ্যতে স্বীয় স্বার্থোদ্ধার করা তার জন্য সহজ হবে।

গ. আসামী ও ফরিয়াদী ছাড়া অন্য এমন ব্যক্তির হাদীয়া যার সাথে বিচারকের আগে থেকেই হাদীয়া আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। তবে বিচারকার্যে নিযুক্ত হবার পর সে বিচারককে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে উপঢৌকন দেয়া শুরু করেছে।

ঘ. শাসনকর্তা বিচারককে নিযুক্ত করার পর যদি উক্ত বিচারকের কাছে তার মোকদ্দমা থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে উক্ত বিচারককে প্রদত্ত হাদীয়া ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে।

ঙ. যে ব্যক্তি বিচারকার্যে নিযুক্ত হওয়ার কারণেই বিচারকের উদ্দেশ্যে হাদীয়া প্রদান করে, তার হাদীয়াও ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা বিচারকার্যে নিযুক্ত না হলে সে হাদীয়া দিত না।

উল্লেখিত অবস্থাসমূহ ছাড়া যেসব অবস্থায় বিচারকের ওপর ঘুষ গ্রহণের অপবাদ আরোপিত হয় না, সেসব অবস্থায় তার জন্য হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ বৈধ। যেমন এমন ব্যক্তির হাদীয়া যিনি আসামী ও ফরিয়াদী নন এবং বিচারক ও তার মধ্যে আগে থেকে আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের কারণে হাদীয়ার আদান-প্রদান ছিল। অনুরূপভাবে নিয়োগকারী শাসনকর্তার হাদীয়াও তিনি গ্রহণ করতে পারবেন যদি তার বিচারালয়ে উক্ত শাসনকর্তার কোন মোকদ্দমা না থাকে।

৩. **মুফতী ঃ** যদি তার সততা ও জ্ঞানের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনার্থে তাকে হাদীয়া প্রদান করা হয় তবে তা জায়েয। কিন্তু যদি তাকে কোন বিশেষ উদ্দেশে হাদীয়া দেয়া হয়- যেমন বিচারকের সামনে নিজের বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন দাবী উত্থাপনের জন্য মুফতীর পক্ষপাতমূলক সাহায্য নেয়া, যাতে সে বিজয় লাভ করে। তাহলে এক্ষেত্রে ফাতওয়া জানতে চেয়েছে এমন ব্যক্তির সুবিধামত ফাতওয়া দেয়ার মাধ্যমে প্রদত্ত হাদীয়া গ্রহণও জায়েয নয়।

৪. **বক্তা ও শিক্ষক ঃ** বেতনধারী বক্তা (ওয়ায়েজ) ও শিক্ষক যদি স্ব স্ব কর্তব্য পালন করেন, এমতাবস্থায় তাদের সম্মানার্থে সততা ও জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ তাদেরকে যদি কোন হাদীয়া ও উপহার প্রদান করা হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা তাদের জন্য জায়েয।

তবে যদি এমন হয় যে, হাদীয়া ছাড়া তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন না কিংবা পরীক্ষায় পাস অথবা নম্বর বাড়ানোর জন্য শিক্ষক মহোদয়কে হাদীয়া প্রদান করা হয়, তাহলে এ উভয়বিধ হাদীয়া গ্রহণ জায়েয হবে না।

৫. অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ যাকে সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনিক কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তিনি কর্মকর্তাই হোন, আর কর্মচারীই হোন ঐ কাজের মাধ্যমে অন্যের স্বার্থ রক্ষার বিনিময়ে প্রদত্ত হাদীয়া গ্রহণ তার জন্য বৈধ নয়। কেননা উক্ত পদের অধিকারী না হলে তাকে হাদীয়া দেয়া হত না। সুতরাং এটা হবে হাদীয়ার ছদ্মাবরণে ঘুষ প্রদান।

এ ব্যাপারে আবু হোমায়েদ আসসায়েদীর হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনুল লুতবিয়্য নামে আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। অতপর আদায় শেষে সে ফিরে এসে বললো, এটুকু তোমাদের জন্য আর এটুকু আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসামূলক বাক্য উচ্চারণের পর বললেন, ব্যাপার কি? আমি কোন একজনকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসেবে পাঠাই, আর সে এসে বলে এটা তোমার, আর ওটা আমার। সে তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকুক দেখুক, তাকে কোন হাদীয়া দেয়া হয় কিনা? যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! সে যা কিছুই এ থেকে গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা ঘাড়ের উপর বহন করে উপস্থিত হতে হবে। যদি তা হয় উট, তাহলে উটের ন্যায় চিৎকার করতে থাকবে, আর গাভী হলে হাম্বা রব করতে থাকবে কিংবা ছাগল হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকবে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত উপরে তুললেন। ফলে আমি তার বগলের নিচের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। তিনবার তিনি বললেন, আমি কি পৌছিয়েছি?[৪২]

এ হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়োগকৃত কর্মচারীর হাদীয়া গ্রহণ হারাম হওয়ার কারণ দর্শিয়ে বললেন- 'কেন সে বাবা-মায়ের ঘরে বসে অপেক্ষা করে দেখে না কেন, তাকে হাদীয়া দেয়া হয় কি-না?' এ দ্বারা বুঝা গেল, তাকে যে কাজের জন্য নিয়োগ করা হলো সে কাজ থেকে স্বার্থ লাভের নিমিত্ত হাদীয়া দেয়ার ফলে তা গ্রহণ হারাম হলো। কেননা তা প্রকতপক্ষে ঘুষ হিসেবেই গণ্য হয়ে যাবে।

এছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস রয়েছে যার মর্মার্থ দাঁড়ায়- কর্মচারীদের প্রতি প্রদত্ত হাদীয়া আত্মসাতকৃত গনীমতের সম্পদের ন্যায় হারাম।[৪৩]

তবে যদি উপরোক্ত কারণ ছাড়া অন্য কারণে হাদীয়া দেয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ বৈধ। যেমন উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে উপরস্থ অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত হাদীয়া কিংবা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের কারণে প্রদত্ত হাদীয়া।[৪৪]

৬. সুপারিশকারী ঃ আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। এ ধরনের কর্তব্য পালনে কোন সুপারিশের

প্রয়োজন নেই। তবে যদি দায়িত্বশীল ব্যক্তি তা পালনে অনীহা প্রকাশ করে, তবে তা করার জন্য সুপারিশ করা যাবে, অর্থাৎ সুপারিশকারীর মধ্যস্থতা গ্রহণ করা যাবে।

যেমন প্রশাসনিক কোন দায়িত্বশীলের কাছে কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা, যাতে তাকে জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দেয়া হয়, কিংবা তার হক তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, কিংবা তাকে তার যোগ্য কোন পদে নিয়োগ করা হয়, অথবা দরিদ্র হওয়ার কারণে তাকে দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে কিছু দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায় সুপারিশকারীকে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন হাদিয়া দেয়া হলে তা গ্রহণ বৈধ হবে না।[৪৫]

এর প্রমাণ হলোঃ আবু উমামা রা. এর হাদীস, যাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের মুসলিম ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করার বিনিময়ে হাদীয়া প্রাপ্ত হয় এবং সেই হাদীয়া গ্রহণ করে। তবে সে সুদের এক বড় দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো।[৪৬]

হাদীসটিতে সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে হাদীয়া গ্রহণকে সুদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, সুদ হারাম। সুতরাং সুপারিশের বিনিময়ে প্রদত্ত হাদীয়াও হারাম।

ইবনে মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অপবিত্র ও মন্দ উপার্জন কি? তিনি বললেন, 'তোমার ভাইয়ের জন্য কোন ব্যাপারে সুপারিশ করার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে দেয়া হাদীয়াই হল অপবিত্র ও মন্দ উপার্জন.....'।[৪৭]

বাস্তবেও আমরা দেখি, সুপারিশকারীর ছদ্মাবরণে সমাজে একশ্রেণীর দালাল তৈরি হয়েছে যারা বড় অংকের ঘুষের বিনিময়ে সুপারিশ তথা দালালীর পেশা গ্রহণ করেছে। এর ফলে জাতীয় ও সামাজিক জীবনেই শুধু নয়, বরং অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তা বিরাট সমস্যা ও হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ভারতের বোফোর্স অস্ত্র কেলেংকারীর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ স্বার্থরক্ষা, সেবা প্রদান ও উপকার সাধন

কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে প্রশাসনিক লোকদের এ বিষয়টিকে আমরা দু'ভাবে আলোচনা করব।

এক ঃ কারো কোন স্বার্থ রক্ষা করা কিংবা তার কোন খেদমত আঞ্জাম দেয়া ঃ

যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী শর্তহীভাবে কারো কোন কাজ করে দেন, তাহলে বিনিময়ে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কোন স্বার্থরক্ষা বা খেদমত করা হলে তা ঘুষ বলে পরিগণিত হবে না। কেননা ব্যাপারটি তখন উপকারের বিনিময়ে উপকার করার শামিলই হবে। কারণ যে ব্যক্তি কারো কোন উপকার করে তখন উপকৃত ব্যক্তিরও উচিত অনুরূপভাবে উপকারকারীর উপকার করা। তাছাড়া এ ধরনের প্রত্যুপকার ও খেদমত শর্তহীনভাবে করা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজেরই অন্তর্গত। ফলে তা অপবিত্র উপার্জন কিংবা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু যদি উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার নিজের কোন কাজ, খেদমত বা স্বার্থোদ্ধার করে দেয়া ছাড়া অন্যের কোন কাজ– যা তার নিজেরই কর্তব্য কাজের অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহলে তার জন্য

এগুলো গ্রহণ হারাম ও ঘুষ বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণের কাছ থেকে কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই তাদের খেদমত করা। অতএব যদি তিনি তার করে দেয়া কাজের পরিবর্তে নিজের কোন স্বার্থোদ্ধারের প্রয়াস চালান, তাহলে তিনি তাঁর উপর আরোপিত কর্তব্য কাজ থেকে ব্যক্তিগত ফায়েদা লুটার বন্দোবস্ত করলেন। আর এটাই হচ্ছে ঘুষের প্রকৃত অর্থ।

দুই ঃ প্রশাসনিক লোকদের কারো উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক আনুকূল্যের যোগান দেয়া ঃ

অনেকে সরাসরি ঘুষ গ্রহণ করতে ঘৃণাবোধ করেন। তাই শুধু কিছু অর্থনৈতিক আনুকূল্যের যোগানেই সন্তুষ্ট থাকেন, যা প্রকৃত অর্থে শেষ পর্যন্ত ঘুষরূপেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এটি আসলে ঐ প্রতারণারই শামিল যা ইহুদীরা আল্লাহর সাথে করেছিল– যখন তাদের উপর শুকরের গোশত ও চর্বি হারাম করা হল, তখন তারা চর্বি গলিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা শুরু করল।

অর্থনৈতিক আনুকূল্য প্রদানের মাধ্যমে উপকার সাধন নিম্নলিখিত ভাবে হতে পারে

ক. ঋণ প্রদান : কোন কোন চতুর লোক নিজের অবৈধ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঋণ দিয়ে থাকে, যাতে তারা তার ঈপ্সিত বাসনা পূরণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে নিজের কোন উপকার বা স্বার্থ লাভের জন্য ঋণ প্রদান অবৈধ।[৪৮]

ফুযালা বিন উবাইদ বলেন, যে ঋণ প্রদান কোন উপকার লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তা এক প্রকার সুদ বলে গণ্য।[৪৯]

আলী রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ঋণ দান থেকে নিষেধ করেছেন যা উপকার লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'উপকার লাভের উদ্দেশ্যে দেয়া ঋণ সুদ বলে গণ্য'।

উপরের বর্ণনাগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমন ঋণ গ্রহণ অবৈধ যার উদ্দেশ্য হল বিনিময়ে উপকার লাভ এবং এটি মূলত ঘুষ আদান প্রদানের কূট কৌশল মাত্র।[৫০]

ইবনে হাজার বলেন ঃ 'উপকারের উদ্দেশ্যে ঋণদান ঋণদাতার জন্য হারাম। কেননা এটি প্রকৃতপক্ষে সুদ। আর সুদের ব্যাপারে যে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে তা উপরোক্ত ঋণদাতার উপরও প্রযোজ্য।' আর যে ঋণ দাতা কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে ঋণ পাওয়ার শর্ত আরোপ করে সে ঘুষ গ্রহীতার আওতায় পড়বে। সুতরাং এ ঋণ গ্রহণ বৈধ নয়।[৫১]

খ. ঋণ গ্রহণ ঃ বিচারক ও সরকারি কর্মচারীর জন্য এমন ব্যক্তি থেকে কোন কিছু ধার নেয়া হারাম যার হাদীয়া গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ নয়।[৫২] কেননা এটি ঘুষ আদান প্রদানের একটি মাধ্যম। ঘুষের সংগায় আমরা আগেই বলেছি 'নিজের পক্ষে রায় প্রদানের জন্য কিংবা নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য বিচারপতি বা অন্য কাউকে যা কিছুই দেয়া হয় তাই ঘুষ'। আর এতদুদ্দেশ্যে 'কিছু ধার দেয়া' সংগাটির আওতায় পড়বে। কেননা শুধু অর্থ সম্পদ দেয়াই ঘুষ নয়, বরং সকল প্রকার উপকার পৌছানো ঘুষের আওতায় পড়তে পারে।

গ. নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি কিংবা ভূমি প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে ঘুষ গ্রহীতার কাছে বিক্রি করা, অথবা ঘুষ গ্রহীতার কাছ থেকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে ক্রয় করা। এটিও প্রকৃত ঘুষের আওতায় পড়বে। কেননা উল্লেখিত নিয়মে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে ঘুষ গ্রহীতার উদ্দেশ্যে বিশেষ উপকার পৌছানো হচ্ছে। আর উপকার পৌছানো ঘুষ বলে গণ্য হতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ লবিং ও তদবীর

লবিং বলতে বোঝানো হয়– অন্যের কাছ থেকে নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজনীয় কাজ উদ্ধারের জন্য এমন কোন মাধ্যম গ্রহণ করা যিনি তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সুপারিশ করবেন। আর লবিংয়ের মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকেই বলা হয় তদ্‌বীর।

কি কাজের জন্য তদ্‌বীর ও সুপারিশ করা হচ্ছে সে অনুযায়ী একে দুটি ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. উত্তম ও প্রশংসিত তদ্‌বীর ও সুপারিশ

যেমন মানুষের উপকার সাধন কিংবা তাদের উপর আপতিত ক্ষতি দূর করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মাধ্যম হিসাবে এমন ক্ষেত্রে কাজ করা যা কোন পাপাচার কিংবা অপরের অধিকার হরণ করার পর্যায়ে পড়ে না। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে দান সদকা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান, বিপদগ্রস্তের বিপদ ও অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করার ব্যবস্থা করা, ঋণগ্রস্তের ঋণ মওকুফ করার জন্য সুপারিশ করা ইত্যাদি।

এ ধরনের ক্ষেত্রে সুপারিশ ও তদ্‌বীর উত্তম হওয়ার দলীল ঃ

১. আল্লাহ্ তা'লার বাণী ঃ 'যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা হতে অংশ পাবে।'[৫৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি কারো জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করে, সে তার জন্য সুপ্রতিদান ও সওয়াব পাবে। আর যে সব কাজে সওয়াব রয়েছে তা করা উত্তম। সুতরাং উল্লেখিত কাজে সুপারিশ করাও উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আসতো তিনি তাকে সবার সামনে বসিয়ে বলতেন ঃ 'এ ব্যক্তির অভাব পূরণের জন্য তোমারা সুপারিশ করো তাহলে সওয়াব পাবে..........'।[৫৪]

হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এর ফলে সওয়াব ও প্রতিদান দেয়া হবে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত কাজে সুপারিশ করা উত্তম।

খ. মন্দ ও হারাম সুপারিশ ও তদ্‌বীর

যেমন– ঘুষ বা ঘুষ জাতীয় কোন ব্যাপারে কিংবা পাপাচার সৃষ্টিতে অথবা কোন অপরিহার্য শাস্তি রদ করার জন্য মধ্যস্থতা করা। অনুরূপভাবে কোন বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করা কিংবা অন্যের হক ও অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করার ন্যায় যে সমস্ত শরীয়ত বিরোধী কাজের দরুণ জাতীয় স্বার্থ কিংবা

অন্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, সে সমস্ত কাজ সফল করার ব্যাপারে তদবীর ও সুপারিশ করা। এর দলীল হলো ঃ

১. আল্লাহ তা'লার বাণী ঃ 'আর যে খারাপ কাজের সুপারিশ করে সে তা হতে অংশ পাবে।'[৫৫]

আয়াতটিতে এ কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে, অন্যায় সুপারিশকারী পাপাচারী ও গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। আর পাপ শুধু হারাম কাজেই হয়ে থাকে। সুতরাং অন্যায়ভাবে সুপারিশ করাও হারাম।

২. উসামা বিন যায়েদ রা. মাখযুম গোত্রের যে মহিলা চুরি করে ধরা পড়েছিল, তার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ করলে তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শাস্তি ওয়াজিব হয়ে পড়েছে, সে ব্যাপারে সুপারিশ করছ? আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত তবে তারও হাত কাটা যেত।

উসামার সুপারিশের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের সুপারিশ জায়েয নয় বরং শরীয়ত বিরোধী।

স্মরণ রাখা দরকার, নিজের অধিকার অর্জনের জন্য মাধ্যম গ্রহণ ঘুষ গ্রহণের আওতায় পড়বে না। কেননা সুপারিশকারীর পক্ষে মধ্যস্থতা করা যেমন হারাম নয়, তেমনি যার কাছে সুপারিশ করা হয়েছে এ সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করা তার জন্য হারাম নয়। বরং কোন ভাল কাজে এ সুপারিশ করা হলে 'সুপারিশকারী' সওয়াব পাবে।

অন্যদিকে হারাম কার্যোদ্ধারের জন্য সুপারিশ করলে তাও ঘুষের আওতায় পড়বে না, যদিও হারাম সাব্যস্ত হবে। কেননা সুপারিশ ঘুষের আওতাভুক্ত নয়। তবে এক্ষেত্রে সুপারিশ হারাম হওয়া ভিন্ন দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষের শাস্তি

কোন অপরাধকে দমন করতে হলে তার বিরুদ্ধে প্রায়োগিক শাস্তির যেমন ব্যবস্থা থাকা উচিত, তেমনি সে অপরাধে জড়িত না হওয়ার জন্য জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক প্রেরণায়ও উদ্বুদ্ধ করা উচিত। বলাবাহুল্য ইসলামী সমাজে ঘুষ নামক দুর্নীতি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য এ উভয়বিধ ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঘুষ নামক অপরাধের বিরুদ্ধে ইসলাম একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। একদিকে ঘুষ একটি পাপাচারমূলক মহা অপরাধ বলে ইসলাম একে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে আধ্যাত্মিক দমন ব্যবস্থা যেমন জোরদার করেছে, তেমনি অন্যদিকে ঘুষের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিচারককে ক্ষমতা প্রদান করেছে এবং গৃহীত ঘুষের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে। এখন আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঘুষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি

হত্যা-রাহাজানি, চুরি ও ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের সাথে জড়িতদের সম্পর্কে ইসলামী আইনে যে রকম সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, ঘুষের সাথে জড়িতদের সম্পর্কে ঠিক সে রকম কোন সুনির্দিষ্ট

শাস্তির ঘোষণা ইসলামী আইনে আসেনি। বরং এ সম্পর্কিত শাস্তির ভার বিচারকের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। তিনি ইসলামী আইনের বিধান সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন। তবে শাস্তির বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে কোন পরিস্থিতিতে কেন ঘুষের আদান-প্রদান হয়েছে এবং অপরাধের চেয়ে শাস্তি কম-বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এ ধরনের শাস্তিকে বলা হয় তা'যীর বা সংশোধনমূলক শাস্তি।[৫৬]

ঘুষের লেনদেন প্রকারান্তরে ইসলামী আইনের বিধান লঙ্ঘন এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করারই শামিল। ফলে ঘুষ আদান-প্রদানকারীদের প্রতি যে শাস্তি প্রয়োগ করলে তাদেরকে এ অপরাধ থেকে মুক্ত রাখা যাবে এবং তা থেকে সমাজকেও পবিত্র করা হবে, এমন যথার্থ শাস্তিই তাদের উপর প্রয়োগ করা উচিত। অন্যায়কে সমাজ থেকে উচ্ছেদের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের মধ্যে যে কোন অন্যায় দেখবে সে যেন তা স্বীয় হস্তপ্রয়োগে দূর করে।'[৫৭]

হস্ত প্রয়োগে অন্যায় উচ্ছেদের দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ওপরই বর্তায়। সুতরাং তারা ঘুষ অপরাধ উচ্ছেদের জন্য সঠিক শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে যে সকল শাস্তি প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ :

১. **আর্থিক জরিমানামূলক শাস্তি :** ঘুষ লেনদেনকারীর উপর আর্থিক জরিমানা করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা দুটো মত পেশ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদসহ অনেক ফকীহ বলেছেন যে, এ শাস্তি তার ওপর প্রয়োগ করা যাবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ, মালেক, আহমদসহ অধিকাংশ ফকীহের মতে আর্থিক জরিমানামূলক শাস্তি প্রয়োগ করা বৈধ। খোলাফায়ে রাশেদীন ও অনেক বড় বড় সাহাবাও এই মত পোষণ করতেন।[৫৮]

ফাতহুল ক্বাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে 'আর্থিক শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে, যদি বিচারক কিংবা শাসনকর্তা তা প্রয়োজন মনে করেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নামাযের জামাতে উপস্থিত হয় না তাকেও আর্থিক শাস্তি প্রদান করা যাবে। এটা আবু ইউসুফের বক্তব্য।[৫৯]

২. **কারারুদ্ধ করার শাস্তি :** ইমাম আহমদের কয়েকজন ছাত্র এ শাস্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। তবে অধিকাংশ উলামার মতে এ শাস্তি প্রয়োগ বৈধ।

৩. **বেত্রাঘাতের শাস্তি :** ইসলামে বিভিন্ন অপরাধের বেলায় বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগের উদাহরণ মেলে। এ প্রসঙ্গে কুরআন-হাদীসে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। অতএব বিচারক বা শাসনকর্তা এ শাস্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করলে ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও উভয়ের মধ্যে সমন্বয়কারী তৃতীয় ব্যক্তির সকলকেই উপরোক্ত শাস্তি প্রদান করতে পারেন।

৪. **চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার শাস্তি :** এ শাস্তি ঐ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে, যারা তাদের প্রতি যে দায়িত্ব পালনের আমানত অর্পিত হয়েছে তার খেয়ানত করে ঘুষ ও তথাকথিত উপঢৌকন গ্রহণ করে থাকে। চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার নজীর রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের যুগেও পাওয়া যায়। সেজন্য বহু ইসলামী আইনবিদ ঘুষ গ্রহীতাকে তার পদবী থেকে বরখাস্ত করার শাস্তি অনুমোদন করেছেন।

৫. একাধিকবার ঘুষ গ্রহণের শাস্তি ঃ যে ব্যক্তি একাধিকবার ঘুষ আদান-প্রদানের অপরাধে লিপ্ত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাকে পূর্বের চেয়ে অধিকতর কঠোর শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা পূর্বের দেয়া শাস্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে তওবাহ করার যে উদ্দেশ্য ছিল তা হাসিল হয়নি। তাই প্রত্যেকবার অপরাধের সাথে সাথে তার শাস্তিও পূর্বের চেয়ে কঠোরতর হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া 'ইসলামী রাজনীতি' নামক গ্রন্থে বলেন, 'যাকে সংশোধনমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, যদি সে পুনরায় পূর্বকৃত অপরাধে লিপ্ত হয় তবে তার শাস্তিও বাড়িয়ে দেয়া হবে।'[৬০]

গৃহীত ঘুষের ব্যাপারে ইসলামের ফয়সালা

এ বিষয়টি দুটো মাসআলার অধীনে আমরা আলোচনা করব।

ক. ঘুষ গ্রহীতা ঘুষের মালিক হবে কিনা?

এটা সুস্পষ্ট যে, ঘুষ গ্রহীতার উপর ঘুষ গ্রহণ সর্বাবস্থায়ই হারাম। সুতরাং ঘুষ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদের ওপর তার সত্ত্ব বা মালিকানা হারাম পন্থায় প্রতিষ্ঠিত। কেননা ঘুষ গ্রহণ মালিকানা সত্ত্ব অর্জনের আইনগত কোন পন্থার আওতাভুক্ত নয়। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রদত্ত ঘুষের ওপর তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। ফলে উক্ত সম্পদে তার যাবতীয় হস্তক্ষেপ ও বেচাকেনা বা ঐ জাতীয় যে কোন চুক্তি মূল্যহীন ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

খ. ঘুষদাতার মালিকানা থেকে ঘুষ বাবদ দেয়া অর্থ-সম্পদ জব্দ করার পর তার মালিক কে হবে?

এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণ দুটো মতে বিভক্ত।

এক ঃ ঘুষ প্রদানের পরও প্রদত্ত ঘুষের ওপর ঘুষদাতার মালিকানা বহাল থাকবে।

সুতরাং তাকেই উক্ত ঘুষ ফিরিয়ে দেয়া উচিত, এটা হাম্বলী মযহাবের শক্তিশালী মত।[৬১]

এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য হলো ঃ যেহেতু অবৈধভাবে এ ঘুষ গ্রহণ করা হয়েছে, তাই তার হুকুম হবে অশুদ্ধ চুক্তিতে গৃহীত সম্পদের ন্যায়। আর সে হুকুম হলো মালিকের কাছে উক্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া।

এ ক্ষেত্রে হানাফী মযহাবের বক্তব্য হলো ঃ যদি ঘুষ দাতার সন্ধান মেলে তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।[৬২] আর যদি সন্ধান না মেলে কিংবা সন্ধান মেলার পরও দূরে থাকার কারণে ফিরিয়ে দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার হুকুম হবে ঐ হারানো মালের হুকুমের অনুরূপ যা প্রাপ্তির-পর মালিক অজানা থাকে।[৬৩]

দুই ঃ ঘুষ প্রদানের পর এর ওপর ঘুষদাতার কোন মালিকানা থাকে না। বরং বায়তুল মাল সরকারী কোষাগার তার মালিকানা সত্ত্বের অধিকারী হবে। অতএব বায়তুল মালেই তা জমা দিতে হবে। এমত পোষণ করা হয়েছে মালেকী মযহাবে।[৬৪] তবে হানাফী ও হাম্বলী মযহাবেও অনুরূপ একটি মত রয়েছে।[৬৫] এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো ঃ

১. ইবনুল লুতবিয়া যাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাকে প্রদত্ত হাদীয়া- যা ঘুষ গ্রহণের অনুরূপ হওয়ায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন– হাদীয়া দানকারীদের কাছে ফিরিয়ে দিতে তিনি নির্দেশ প্রদান করেননি। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য 'এটা তোমাদের আর এটা আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে' এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন এবং বিশেষ করে হাদীয়া ফেরত দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেননি– এসবের মধ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ধরনের হাদীয়া যা ঘুষ হিসাবে গণ্য, গ্রহীতাকে যেমন ফেরত দেয়া হবে না, তেমনি দাতাকেও ফেরত দেয়া হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় তা বায়তুল মালেই জমা দেয়া হবে।

২. উমর রা. তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে প্রদত্ত হাদীয়া বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে আবু হোরায়রা রা.-কে দেয়া হাদীয়াও বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন।

অতএব উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, যখন হাদীয়া যা ঘুষ বলে গণ্য তা থেকে দাতার মালিকানা বাতিল হয়ে যায় এবং তা বায়তুল মালে জমা দেয়া হয়, তখন প্রকৃত ঘুষের ক্ষেত্রে এ হুকুম আরো উত্তমরূপে বলবৎ হবে।

ড. আবদুল্লাহ তুরাইকী দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, ঘুষদাতার প্রতি শাস্তি স্বরূপ তা ফেরত দেয়া হবে না। কেননা সে হারাম পন্থায় অগ্রসর হয়েছে। আর যদি সে মুবাহ ও জায়েয পন্থায়[৬৬] ঘুষ প্রদান করে থাকে তাহলে প্রথমোক্ত মতানুযায়ী তাকে তা ফেরত দেয়া জায়েয।[৬৭]

ঘুষ আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক বিরাট সমস্যা। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হল মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের জনগণকে ঘুষের প্রতি ইসলামের বিধান ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং ইসলামী আইনের আলোকে ঘুষ আদান-প্রদানের কাজে লিপ্ত ব্যক্তি ও মধ্যস্থতাকারীদের সঠিক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

তথ্যসূত্র :

১. হাশিয়াত ইবনে আবেদীন, ৫ম খণ্ড পৃ: ৩৬২।
২. সূরা আল-বাকারাহ ১৮৮।
৩. হাদীসটি ইমাম তিরমিযি, ইমাম আহমাদ ও ইবনে হিব্বান আবু হুরাইরা রা. হতে এবং ইমাম আবু দাউদ আবদুল্লা ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন।
৪. হাদীসটি ইমাম আহমদ, তাবরানী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন।
৫. হাদীসটি বাযযার তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
৬. আবদুর রাযযাক তাঁর মুসনাদে এ হাদীসটির বর্ণনা করেছেন।
৭. তাবরানী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
৮. 'উলামা' শব্দটি আরবী 'আলেম' শব্দের বহুবচন অর্থ জ্ঞানী। আরবী পরিভাষায় ইসলামী জ্ঞানে পরিপুষ্ট জ্ঞান সাধকদেরকে উলামা বলা হয়।

৯. ফাতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড পৃ: ৮৫৫, হাশিয়াত ইবনে আবেদীন ৫ম খণ্ড পৃ: ২৬২, নিহায়াতুল মোহতাজ শরহে আলমিনহাজ ৮ম খণ্ড পৃ: ৯৫, কাশশাফুল কেনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ: ৩৬৬।
১০. আহকামুল কুর'আন- কুরতুবী ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ: ১৮৩-১৮৪।
১১. আল-মুহাল্লা বিল আসার ৯ম খণ্ড পৃ: ১৫৭।
১২. সূরা আল মায়েদা আয়াত ২।
১৩. সূরা আননিসা আয়াত ২৯।
১৪. আবু দাউদ হাদীসটি তার সুনানে বর্ণনা করেছেন।
১৫. ইমাম আহমদ মুসনাদে আহমদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
১৬. সুনানে তিরমিযী।
১৭. আব্দুর রাযযাক মুসনাদ গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. ইসলামে ঘুষের অপরাধ: পৃষ্ঠা ১৭১।
২০. আহকামুল কুর'আন, জাস্সাস্ ৪র্থ খণ্ড পৃ: ৮৬, আল্-মুহাল্লা বিল্-আসার ৯ম খণ্ড পৃ: ১৫৭।
২১. আহকামুল কুর'আন, জাস্সাস্ ৪র্থ খণ্ড পৃ: ৮৬।
২২. সূরা আন নিসা- আয়াত- ২৯।
২৩. ইসলামে ঘুষের অপরাধ পৃষ্ঠা ৭২।
২৪. আলওয়াজিব ফি কাওয়ায়েদিল ফিকহিয়া পৃষ্ঠা ১৭৮।
২৫. আল-ইনায়া শরহ্ আল-হিদায়া খণ্ড ৩ পৃ: ২৬৯, শারহ্ আল-কানয খণ্ড ২ পৃ: ৮৩, আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া খণ্ড ৩ পৃ: ২১৪, আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া, আবু ইয়া'লা পৃ: ৫৬, মুইনুল হুককাম পৃ: ৯।
২৬. সূরা আন নিসা- আয়াত ৫৮।
২৭. সূরা আনফাল আয়াত ২৭।
২৮. মুসতাদরাকে হাকেম।
২৯. মুসনাদে আবুইয়ালা।
৩০. সহীহ্ বুখারী।
৩১. আল ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া তৃতীয় খণ্ড পৃ: ২২৬।
৩২. মুসনাদে ইমামে আহমদ ও সুনানে তিরমিযী।
৩৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর যদি মুসলিম উম্মাহের মুজতাহিদগণ কোন যুগে যে কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, তবে তা উম্মাতের এজমা বলে অভিহিত হয়ে থাকে, দেখুন, আল-মুস্তাফা, গাযালী, ১ম খণ্ড পৃ: ১৭৩।
৩৪. ইসলামে ঘুষের অপরাধ, পৃষ্ঠা ১৮১।
৩৫. কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ছাড়াই যা করতে শরীয়ত উৎসাহিত করেছে– যা করলে পূণ্য লাভ হয় এবং না করলে পাপ ও শাস্তি হয় না- তাকে বলা হয় মানদুব। দেখুন, আল আহকাম, ইবনে হাযম, ১ম খণ্ড পৃ: ৪০ ও ৩য় খণ্ড পৃ: ৩২১।
৩৬. উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ্ আল বোখারী একাদশ খণ্ড পৃ: ৪০৭।
৩৭. মুইনুল হুক্কাম পৃ: ১৭।
৩৮. আল ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া খণ্ড ৩ পৃ: ২২৬।
৩৯. সুনানে তাবরানী।
৪০. ইসলামে ঘুষের অপরাধ পৃ: ৭০।

৪১. মুইনুল হুক্কাম পৃ: ১৭।
৪২. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।
৪৩. মুসনাদে আহমদ ও সুনানে তাবরানী।
৪৪. হাশিয়াত ইবনে আবেদীন খণ্ড ৫ পৃ: ৩৭৩-৩৭৪।
৪৫. মাজমু' ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ৩১তম খণ্ড পৃ: ২৮৬।
৪৬. মুসনাদে ইমাম আহমদ ও সুনানে আবু দাউদ।
৪৭. প্রাগুক্ত, ৩১ খণ্ড পৃ: ১৮৬।
৪৮. হাশিয়াত ইবনে আবেদীন ৫ম খণ্ড পৃ: ৩৭২।
৪৯. সুনানে বায়হাকী।
৫০. নাইলুল আওতার ৫ম খণ্ড পৃ: ২৬২।
৫১. ইসলামে ঘুষের অপরাধ পৃ: ৮৬।
৫২. হাশিয়াত ইবনে আবেদীন ৫ম খণ্ড পৃ: ৩৭২।
৫৩. সূরা আননিসা- আয়াত ৮৫।
৫৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।
৫৫. সূরা আন নিসা- আয়াত ৮৫।
৫৬. কোন কোন অপরাধ বা পাপচারের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন কর্তৃক আরোপিত সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি বা কাফফারা থাকে না। বরং বিচারকের উপর সাধারণ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে এ শাস্তি নিরূপনের ভার অর্পিত হয়। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এ ধরনের শাস্তিকে বলা হয় তা'যীর বা সংশোধনমূলক শাস্তি।
৫৭. হাদীসটি মুসলিম তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।
৫৮. আততুরূ আল হুকমিয়া, ইবনুল কাইয়েম পৃ: ২৪৬।
৫৯. ফতহুল ক্বাদীর ৪র্থ খণ্ড পৃ: ২১২।
৬০. ইসলামী রাজনীতি, ইবনে তাইমিয়া পৃ: ১১২।
৬১. আল-মুগনী ওয়াশ শরহুল কাবীর, একাদশ খণ্ড পৃ: ৪৩৮ আল-ইনসাফ একাদশ খণ্ড পৃ: ২১২, কাশশাফুর কেনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ: ৩১৭।
৬২. হাশিয়াত ইবনে আবেদীন ৫ম খণ্ড পৃ: ৩৬২, আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া ৩য় খণ্ড পৃ: ২১৪।
৬৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া ৩য় খণ্ড পৃ: ২২৬।
৬৪. হাশিয়াত আল-রাহুনী ৭ম খণ্ড পৃ: ৩১০-৩১২।
৬৫. আল্-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া ৩য় খণ্ড পৃ: ২২৬, কাশ্শাফুল কেনা' একাদশ খণ্ড পৃ: ৪৩৮।
৬৬. কোন অবস্থায় ঘুষ দেয়া জায়েয তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।
৬৭. ইসলামে ঘুষের অপরাধ, পৃ: ১৬০।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ৪১-৫৩

ইসলামী শরীয়তের লক্ষ ও কল্যাণসমূহ

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

আহকামের উৎস অনুসন্ধান

কুরআন ও হাদীসে যে সমস্ত আহকাম তথা বিধান দেয়া হয়েছে যখন আমরা সেগুলোর উৎসসমূহ পাঠে ব্রতী হই, আমরা দেখতে পাই সেগুলো সবই শরয়ী আহকামের মধ্যে লুকানো শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রথমত : কুরআন ভিত্তিক

১. আল্লাহর বাণী : 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।'[৪২]

দুটি বস্তু বা দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের তাৎপর্য হচ্ছে : তাদের উভয়ের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক বিষয়ে দুই প্রান্তিকতায় আক্রান্ত না হয়ে ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রবণতা সৃষ্টি করা। কাজেই মানব জাতির মধ্যে এ ধরনের ইনসাফ ও আদল প্রতিষ্ঠা করাই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য। আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে এ অর্থই প্রতীয়মান হয় যে, আদল ও ইনসাফের বিপরীত তাৎপর্য পাপ, নির্লজ্জতা ও জুলুম এ তিনটি অসৎবৃত্তি থেকে বিরত থাকার দায়িত্ব মানুষের ওপর বর্তেছে। এ তিনটি ধ্বংসাত্মক বৃত্তি মানব গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে জটিলতা সৃষ্টি করে।

এ আয়াতটি সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : 'কুরআনে কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ক এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। সমগ্র কুরআনে এ সম্পর্কিত এ আয়াতটি ছাড়া অন্য কোনো আয়াত না থাকলেও শুধুমাত্র এ আয়াতটিই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও পথনির্দেশের জন্য যথেষ্ট হতো। এটির সমার্থবোধক অন্য একটি আয়াত হলো : 'আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারদের ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।'[৪৩]

লেখক, ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থ 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারীয়াতিল ইসলামীয়াহ' থেকে এ প্রবন্ধটি গৃহীত।

২. আল্লাহর বাণী : 'হে মুমিনগণ! রসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও।'[৪৪]

রসূল যে জিনিসের দিকে মানুষকে ডাকেন সেটাকে আল্লাহ 'হায়াত' তথা জীবনের জন্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে হায়াতের অর্থ হলো ইহকাল ও পরকালের সঠিক জীবন। কারণ কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অংশে অস্তিত্বশীল হওয়া ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ মানুষের চিরন্তন কল্যাণকে ইসলামী দাওয়াতের অনুসরণ এবং ইসলামী হেদায়াত আঁকড়ে ধরার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ তাৎপর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপকারী পরবর্তী আয়াত হচ্ছে ঃ 'মুমিন অবস্থায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।'[৪৫]

৩. আল্লাহর বাণী ঃ 'মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর বিরোধী। যখন সে ফিরে যায়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।'[৪৬]

এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জাতিদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ তারা ইসলামের হেদায়াত ও শিক্ষা আঁকড়ে ধরার আহ্বানকে মিথ্যা মনে করতো। তারা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও বংশ ধ্বংস করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। এ ধরনের তৎপরতা আইনদাতার সৃষ্টিগত ও নির্দেশগত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কারণ যে জিনিসের ওপর মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল সেই বংশ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত থাকা চরম অর্থহীন কাজ। তাছাড়া মহান আল্লাহ ইসলামী শিক্ষা জগতে পরিভ্রমণকে সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠিতে পরিণত করেছেন। কারণ শরয়ী আহকামের বাস্তবায়ন এবং মানব জীবন ও তার কল্যাণ সাধন যে জিনিসের ওপর নির্ভরশীল তা সংরক্ষণ করতে পারে এই শিক্ষা সফর।

৪. এখানে আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলোতে আহকাম প্রবর্তনের কারণ আংশিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব আহকামের মাধ্যমে আইনদাতার উদ্দেশ্যের দিকেও এসব আয়াত আমাদের আহ্বান জানায়। যেমন আল্লাহর বাণী ঃ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।'[৪৭]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান।'[৪৮]

তিনি আরো বলেন ঃ 'হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই জীবন রয়েছে।'[৪৯]

মদ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ 'মদ ও জুয়ার মধ্যে রয়েছে বিরাট ক্ষতি এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে।'[৫০] তবে তাদের ক্ষতি ও উপকার সম্পর্কে তিনি আরো বলেন ঃ 'শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[৫১]

এসব আয়াত শরয়ী আহকামের সাহায্যে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। সে উদ্দেশ্য হলো ঃ মানুষ থেকে সংকীর্ণতা, কঠোরতা, কষ্ট, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা। আল্লাহর স্মরণ ও সালাতের প্রতিবন্ধকতা থেকে তাকে মুক্ত করা। মানুষের প্রাণকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। এগুলো সবই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য। এসব আয়াত এ কথাও প্রমাণ করে যে, আইন প্রণয়নের মধ্যে অবশ্যই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাত বা হাদীস

১. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ 'ঈমানের সত্তরের বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ না থাকার সাক্ষ্য দেয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে কষ্টকর জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া।'[৫৩] আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের তাৎপর্য দুটি জিনিসের মধ্যে একত্র করেছেন। প্রথম দিকটি হচ্ছে, তওহীদ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই ঈমানের সূচনা বিন্দু! আর এর শেষ সীমানা নির্ধারিত হয়েছে দ্বিতীয় দিক দিয়ে। সেই দিকটি হচ্ছে সাধারণ উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিকুলের সেবার প্রকৃষ্ট নমুনা। যেমন পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য পথকে কষ্টদায়ক জিনিস থেকে মুক্ত রাখা। এথেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আইন প্রণেতার ছোট হোক বা বড় উদ্দেশ্যাবলী কারণসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমার্থবোধক অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে তিনি বলেন : 'মানুষের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অস্তিত্ব তার জন্য 'সাদকাহ' স্বরূপ। নিত্যদিনের সূর্যোদয়ে দুই জিনিসের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সাদকাহ। কোনো ব্যক্তিকে তার বাহনে মালপত্র উঠানো-নামানোর ব্যাপারে সহায়তা দান করা সাদকাহ। ভালো কথা বলাও সাদকাহ। সালাতের উদ্দেশ্যে পথচলা প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকাহ। পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সাদকাহ'[৫৪]

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

'সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবার। যারা এই পরিবারের বেশী উপকার করবে তারা আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।'[৫৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তাঁর বান্দাদের উপকার ও সেবা করাকে অগ্রাধিকার দান করেছেন। আল্লাহর উদ্দেশ্য ও বান্দাদের কল্যাণ পরিপূর্ণ করার মানসে এ ধরনের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন ও জীবিকার কল্যাণ সাধন করার প্রেক্ষিতে ফযীলত ও মর্যাদা নিরূপিত হয়ে থাকে এবং মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির আলামতসমূহ পরিত্যাগ না করার প্রেক্ষিতে অসম্মান ও অবমাননা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোনো মুসলমান একথা বলতে পারে না যে, মর্যাদা ও অবমাননা এমন দুটি বিষয় যা কেবলমাত্র কাজটি করলেই তার উপযোগী হয়ে যায়, কাজের পরিণাম ও পরিমিতির দিকে লক্ষ করার দরকার নেই।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : '(ইসলামে) কষ্ট দেয়া ও কষ্ট পাওয়ার নীতি স্বীকৃত নয়।'[৫৬] কষ্ট দেয়ার অর্থ হলো, নিজে কিংবা অপরের মাধ্যমে মানুষকে কষ্টকর বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা করা। কষ্ট পাওয়ার অর্থ হলো দুজনের মধ্যে কষ্টকর বস্তু ছড়িয়ে দেয়ার পারস্পরিক প্রচেষ্টা হাদীসটির একটি সর্বজনীন নীতি। আল্লাহর রসূল মুসলমানদের সামনে কষ্ট ও বিপর্যয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেন এ বাণীর মাধ্যমে। ফলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত কল্যাণ ইসলামী শরীয়তের অংগীভূত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত : ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে শরয়ী রীতিনীতির দলীল গ্রহণ করা

প্রথম নিয়ম : শরীয়ত প্রণেতা নিষিদ্ধ পাপ কাজগুলোকে 'সগীরা' ও 'কবীরা' নামে ভাগ করা এবং এ বিভক্তি অনুসারে পাপের তারতম্য নির্ণয় করা। আর এর মাধ্যমে আইন প্রণেতার সর্বাধিক আনুগত্য করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা। যেমন সীমানার শেষ প্রান্তে পৌঁছার ইচ্ছা করা। আসলে সবচেয়ে বড় পাপ দমন করতে চাওয়া সবচেয়ে ছোট পাপ দমন করারই নামান্তর। কাজেই চাওয়া পাওয়ার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কল্যাণকর বস্তু চাওয়া এবং অনিষ্টকর বস্তু রহিত করার মাধ্যমেই কাংখিত বস্তুগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। এজন্য কল্যাণ পূর্ণ ও অধিক পূর্ণ হিসাবে বিভক্ত হওয়ার ফলে ভালো কাজ উত্তম ও সর্বোত্তম দুভাগে বিভক্ত। অনুরূপভাবে পাপ কাজও ক্ষতিকর এবং অধিক ক্ষতিকর হওয়ার ফলে সগীরা ও কবীরা রূপে বিভক্ত।[৫৭]

দৃঢ় ইচ্ছা স্বভাবতই বিভক্ত নয়, যদিও একথা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, গুনাহ বা পাপকাজ পাপকারীর ওপর অনিষ্টকর প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী নির্ণীত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চিহ্নিত সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিসের কথা বলা যায়। তিনি বলেছেন : 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, এতীমের সম্পদ আত্মসাত করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা।'[৫৮]

এগুলো ছাড়া অন্যান্য পাপগুলোকে কুরআন 'সাইয়্যেয়াত' তথা ছোট গুনাহ এবং 'লামাম' তথা সামান্য অপরাধ নাম দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে : 'তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করবো।'[৫৯]

আল্লাহ বলেছেন : 'যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে ছোটখাট অপরাধ করলেও তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।'[৬০]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, পাপ ও অপরাধজনিত কাজের প্রভাবের ফলেই পাপ ও অপরাধের তারতম্য হয়ে থাকে। মানুষকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে আকর্ষণ করার হার ও মান অনুযায়ী অপরাধের ধরন চিহ্নিত হবে।

অন্যদিকে সৎ ও নেক কাজের পরিণতির ভিত্তিতেই সেকাজের মান ও স্তর নির্ণীত হবে। যে কাজের পরিণতি জনকল্যাণমুখী তার গুণগত মানের তারতম্য অবশ্যই থাকবে।

এরি ভিত্তিতে আলেমগণ দলীল দ্বারা প্রমাণিত সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের উপর অনুরূপ এমন কতিপয় অপরাধের কথা অনুমান করেছেন যেগুলো সগীরা হওয়া সত্ত্বেও প্রমাণিত কবীরা গুনাহের নিকটবর্তী করে দেয়। যেমন ইয্য ইবনে আবদুস সালাম তাঁর 'কাওয়ায়েদুল আহকাম' গ্রন্থে বলেছেন : কবীরা ও সগীরার পার্থক্য জানতে হলে প্রমাণভিত্তিক কবীরা গুনাহের ক্ষতিকর বিষয়ের সামনে তার গুনাহের বিপর্যয়গুলো তুলে ধরতে হবে। যদি গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব কবীরা গুনাহের প্রভাবের চেয়ে কম হয় তাহলে তা হবে সগীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহের ন্যূনতম ক্ষতির সমান হলে কিংবা তার চেয়ে বেশী হলে তা কবীরা হিসাবে গণ্য হবে। তিনি আরো বলেছেন : আল্লাহ বা রসূলকে গালি দেয়া, রসূলের অবমাননা করা কিংবা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কাবাঘরকে দুর্গন্ধময় করা অথবা আবর্জনার স্তূপে কুরআন নিক্ষেপ করা ইত্যাকার কাজগুলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। অথচ শরীয়ত প্রণেতা সুস্পষ্টভাবে এগুলোর কবীরা গুনাহ হওয়ার কথা বলেননি। এমনিভাবে কোনো সতী-সাধ্বী মহিলাকে ধর্ষণের জন্য আটকে রাখা কিংবা হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানকে আটক করার ক্ষতিকর পরিণতি এতীমের সম্পদ আত্মসাত করার চেয়েও ভয়াবহ, যদিও এতীমের সম্পদ আত্মসাত করা কবীরা গুনাহ। অনুরূপভাবে কাফেররা যদি মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে উৎখাত করে, তাদের আবালবৃদ্ধবনিতাকে গালিগালাজ করে, তাদের ধনসম্পদ লুট করে, তাদের মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে এবং তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করে, তাহলে তাদের এধরনের অপতৎপরতার ক্ষতিকর পরিণতি যুদ্ধের মাঠ থেকে বিনা কারণে পলায়ন করার চেয়েও বেশী ভয়ংকর, যদিও একাজ কবীরা গুনাহ।[৬১]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পাপের স্তর ক্ষতিকর পরিণতির ভয়াবহতার সাথে সম্পৃক্ত, যদিও পাপকাজটির কবীরা গুনাহ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। এ ধরনের পাপ কাজকে কবীরা গুনাহের হুকুমের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। পাপ কাজের এ ধরনের বিভক্তিকরণ একথাই প্রমাণ করে যে, আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য কল্যাণ ও অকল্যাণের ছোটবড়র তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই যখন কাজের কল্যাণ ব্যাহত হয় তখন তা অর্জন করার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং তা অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিরর্থক ঘোরাফেরা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মানব কল্যাণের হেফাজত এবং সংঘটিত বা আসন্ন বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য শরীয়তের আগমন ঘটে। পাপকাজের কবীরা ও সগীরা হিসাবে বিভক্ত হওয়া অধিকাংশ আলেমের মতে স্বীকৃত ও গৃহীত।[৬২]

দ্বিতীয় নিয়ম

জবরমূলক আহকাম রচনার ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করা। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী হওয়া এবং সাবালকত্ব লাভই মানুষকে দায়িত্বশীল করে। তবে যে কাজ করা উচিত নয় এমন কোনো কাজ যখন কোনো ব্যক্তি করে তখন তার পেছনে থাকে কোনো ব্যক্তির

কল্যাণ, যা আহকাম তৈরি করার কারণে পরিণত হয়। তাই শরীয়তসিদ্ধ জবরের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ্ ও বান্দার হকের যে মাসলিহাত বা কল্যাণগুলো অর্জিত হয়নি তার জন্য জবর। এক্ষেত্রে যার ওপর জবর করা হচ্ছে তাকে পাপী ঠাওরাবার কোনো অবকাশ নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে ও ভুলক্রমে, জেনে ও না জেনে এবং পাগল ও শিশুদের ওপর জবর করা যায়। এ কারণে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, জেনে বুঝে বা ভুলক্রমে মানুষের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা সমান কথা। কারণ উভয় ক্ষেত্রে সম্পদের সমান ক্ষতি হয় এবং এটিই তার জামানতের কারণ, যদিও গুনাহের কারণের মধ্যে পার্থক্যভেদ রয়েছে।[৬৩]

এগুলো শরীয়তের সাধারণ বিধান। এগুলো ছাড়া জাতীয় কল্যাণ পূর্ণ হয় না। যদি সংঘটিত অপরাধের জামানতের ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে একজন অন্যজনের সম্পদ-সম্পত্তি বিনষ্ট করতো, ভুল হওয়ার দাবী করতো এবং ইচ্ছা না থাকার বাহানা করতো। আর এটি হতো অপরাধ দণ্ডবিধির বরখেলাফ। কারণ এগুলো বিরোধিতা করা এবং বান্দার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার অনুকূল। এ কারণে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মধ্যে শরীয়ত পার্থক্য করেছে।[৬৪]

তবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও অদায়িত্বপ্রাপ্তের মধ্যে শরয়ী বিধানের একত্রীকরণ নীতি একটি বিতর্কিত ও ইজতিহাদী বিষয়। শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে উভয়কে সমান করার ও না করার কোনো দলীল নেই। যারা উভয়কে সমান মনে করেন তারা সম্পদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন। কারণ মহান আল্লাহ্ সম্পদের উপস্থিতিকেই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন। এই সম্পদের ওপর গরীবের অধিকার রয়েছে, তার মালিক শরীয়ত নির্ধারিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হোক বা না হোক। এমনিভাবে পশু-পাখি, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয় করার অধিকার স্বীকৃত ও অবধারিত। ঠিক তেমনি সম্পদশালীর সম্পদের মধ্যে গরীব-মিসকিনদের জন্য একটি অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।[৬৫]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, মহান আল্লাহ্ এসব হুকুম ও অনুরূপ আহকাম কাঠামোগত সম্বোধনের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারণ করেছেন, দায়িত্বপ্রাপ্তির শর্তাবলী পূর্ণ হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এর উদ্দেশ্য হলো, মানব কল্যাণসমূহের তদারকী করা। এধরনের বিধানের প্রচলন না থাকলে অনিচ্ছা ও ভুলের মধ্যে মানবাধিকার ও জনকল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যেতো। কাজেই শরীয়ত প্রণেতা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় এসব কল্যাণের হেফাজত এবং লক্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসব আহকাম সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন।

তৃতীয় নিয়ম : লেনদেন ও ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন শর্তাবলী। ব্যবহারিক জীবনের সুস্থতা, গুণাবলী ও প্রভাবের শর্তাবলী মানব কল্যাণসমূহ সাধিত হওয়ার প্রক্রিয়া অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন ইজারাদারী, পশুপালন ও চাষাবাদের চুক্তি করলে মেয়াদ নির্দিষ্ট করতে হয় এবং বিবাহের ক্ষেত্রে তালাকের অবকাশ রাখতে হয়। কারণ এধরনের চুক্তির মাধ্যমে কল্যাণ লাভের উপায় হলো মেয়াদ নির্দিষ্ট করা। বিপরীত পক্ষে বৈবাহিক চুক্তির ক্ষেত্রে সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করা

ক্ষতিকর। কারণ বৈবাহিক চুক্তির লক্ষ হলো বংশ সংরক্ষণ। অন্যদিকে অস্তিত্বহীন বস্তুর বেচাকেনা ও ইজারা দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ এ ধরনের লেনদেনের মধ্যে প্রতারণা রয়েছে। এভাবে চুক্তিপত্রের বিভিন্নতার ফলে শর্তাবলীও বিভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক চুক্তির উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট কল্যাণ সাধন করা। যেমন ইজারাদারী, ব্যবসায় ও বিবাহের মধ্যে বিশিষ্ট কল্যাণ রয়েছে।[৬৬]

চতুর্থ নিয়ম : কল্যাণের সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারে শরীয়তের বিবেচনা। শরীয়ত প্রচলিত প্রথার ব্যাপারে বিবেচনা করে থাকে এ শর্তে যে, এ প্রথা যেন তার জন্য বিপদজনক এবং মানুষের কল্যাণ বিনাশক না হয়। এ থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, আরবের জাহেলী যুগের প্রচলিত অবিনাশক প্রথাসমূহ বিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতার নিকট স্বীকৃত ছিল। যেমন হত্যার বিনিময়ে রক্তপণ নেয়া বা কসম খাওয়া, বিয়ের জন্য স্ত্রীর খোরপোষ বহন করার শর্ত, ঋণ ব্যবস্থা, কাবার গিলাফ লাগানো ইত্যাকার কাজগুলো জাহেলী যুগেও প্রশংসিত ছিল। এগুলো উত্তম প্রথা এবং উন্নত চারিত্রিকগুণের প্রতীকরূপে সর্বসম্মত ভাবে স্বীকৃত ছিল।[৬৭]

'উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।'[৬৮] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে উপরোক্ত প্রথাগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যেসব প্রথা ও রসম-রেওয়াজ হিতকর ও জনকল্যাণকর সেগুলোর ব্যাপারে বিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতার বিবৃতি অত্যন্ত সহজাত, সম্মানজনক ও বিজ্ঞতাপ্রসূত। এ কারণে শরয়ী আহকামের লক্ষসমূহ মানুষকে এদিকে ধাবিত করে।

উপরোক্ত দলীলগুলোর ভিত্তিতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, শরীয়ত প্রণেতার অবশ্যই লক্ষ ও উদ্দেশ্য আছে। তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমেই এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায়। ফিক্হ শাস্ত্রের সমগ্র পরিসরে নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট, সাধারণ-অসাধারণ, খুটিনাটি-পূর্ণাঙ্গ বিষয়সমূহের মধ্যে যেমন দলীল রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে গবেষণা করে পূর্ববর্তী আলেমগণ এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এগুলো সবই শরীয়ত প্রণেতার লক্ষসমূহ সংরক্ষণে সর্বদা নিয়োজিত।

এজন্য ইমাম গাযালী র. বলেছেন : অকাট্য দলীল সহযোগে জানা গেছে যে, প্রাণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য।[৬৯] ইবনে আবদুস সালাম বলেছেন : জেনে রাখো, মহান আল্লাহ এমন প্রত্যেক ব্যয় খাত বৈধ করেছেন যার সাহায্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করা এবং কল্যাণ পূর্ণ হওয়া সম্ভব। কাজেই যার সাহায্যে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কল্যাণ লাভ করা যায় তার সবই বৈধ। যদি কল্যাণ সমগ্রক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ হয় তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ কল্যাণ বিধি সম্মত। আর যদি কল্যাণ সর্বক্ষেত্রব্যাপী না হয়ে কতিপয় খাতে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট খাতেই তা বিধিসম্মত হবে, অন্য খাতগুলোতে নয়। তবে দুটি অধ্যায়ের কল্যাণের প্রেক্ষিতে এমন কতিপয় ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা যায় যেগুলো অন্যকে রহিত করতে সক্ষম।[৭০]

ইমাম শাতবী তাঁর 'আল-মাওয়াফিকাত' গ্রন্থে বলেছেন : শরীয়ত প্রণেতার অবস্থান এবং তিনি যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন সেই অনুযায়ী মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত কল্যাণের নিমিত্ত আহকাম ও বিধানসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে, মানুষের কামনা-বাসনা বা প্রবৃত্তির দাবী অনুযায়ী নয়। কাজেই শরীয়তের বিধানসমূহের অনুবর্তন ছাড়া স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে বান্দার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়।[৭১]

আহকামের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী নীতি হচ্ছে এই যে, বান্দার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে আহকাম বৈধ হবে এবং তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিরোধী হলে তা হবে অবৈধ।

'নাবুরাসূল উকূল' গ্রন্থে বলা হয়েছে : আল্লাহ মহাজ্ঞানী। তাঁর সব কাজই জ্ঞানময়। তিনি উদ্দেশ্যবিহীন কোনো হুকুম দেন না। তার কোনো কারণ থাকবে এবং কারণ ছাড়া তিনি তাকে পূর্ণতা দান করেন না, একথা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর কাজ ও কৌশলের সাথে লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত। মোটকথা কুরআন ও হাদীসের যেসব 'নস্' দ্বারা বিধি-নিষেধ সূচক আহকাম প্রমাণিত সে সব নসের সাথে শরয়ী কারণ সমন্বিত কল্যাণ ও হিকমতেরও বিবরণ দেয়া হয়েছে। কাজেই যে কাজের সাথে কল্যাণ সম্পৃক্ত কল্যাণ সাধনের জন্য সেকাজ করার নির্দেশ রয়েছে। আর দুষ্টের দমনের উদ্দেশ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, কল্যাণমূলক কাজ করা ওয়াজিব এবং ধ্বংসাত্মক কাজ দমন করা ওয়াজিব। কারণ শরয়ী বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এটাই। যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, শরয়ী বিধান প্রবর্তনের মধ্যে প্রবর্তকের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তখন কর্ম সম্পাদনের সময় এসব বিধানের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় শরীয়ত প্রবর্তকের দৃষ্টিতে তা বিবেচিত হবে না। এ কারণে শরীয়ত প্রবর্তকের দৃষ্টিতে যেসব বিরোধমূলক কাজ অগ্রহণযোগ্য আমরা এখানে সেগুলোর একটি বিবরণ দেবো। তাই প্রথম বিষয়ের আলোচনার এখানেই ইতি টানছি।

শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ বাতিল

একথা সর্বজনবিদিত, শরীয়ত প্রণেতার শরয়ী বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আইনের আওতাধীন করা, যাতে সে পরিস্থিতির গণ্ডী থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এভাবে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহর বান্দায় পরিণত হয়।[৭২] এর সপক্ষে অনেক দলীল প্রমাণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আইনদাতার লক্ষ ও উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণের নিন্দায় কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক দলীলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও প্রচলিত রীতি প্রমাণ করে যে, কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতো এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই সে প্রবৃত্তির পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরতো। আইনদাতার ইচ্ছা বিরোধী কাজে, হত্যাকাণ্ডে, অর্থহীন প্রতিযোগিতায় এবং ক্ষেতখামার ও বংশ বিনাশক কাজে অনিবার্যভাবে লিপ্ত থাকতো। প্রবৃত্তির দাসত্ব করা এমন একটি ব্যাপার যার নিন্দা করা হয়েছে কুরআন-হাদীসে এবং সুস্থ বিচার বুদ্ধিতেও।

এহেন অবস্থায় কারো পক্ষে এ ধরনের দাবী করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, শরীয়তের বিধান মানুষের কামনা-বাসনা ও স্বার্থ অনুযায়ীই তৈরি করা হয়েছে। তবে ওয়াজিব ও হারামের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও স্বার্থসমূহের অবাধ চাহিদার প্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে একথা সুস্পষ্ট। 'তুমি অমুক কাজটি করো' এবং 'তুমি অমুক কাজটি করো না'– একটি আদেশ সূচক এবং অন্যটি নিষেধ সূচক বাক্য। দুটি বাক্যেরই উদ্দেশ্যে আছে অথবা নেই। যদি এ কথায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ বাক্য দুটিতে আদেশ ও নিষেধের দাবী অনুযায়ী দায়িত্বশীলের সপক্ষীয় উদ্দেশ্য এবং কারণভিত্তিক বাসনা আছে তাহলে সেটা হবে ঘটনাক্রমিক, প্রকৃত অর্থে নয়।[৭৩]

শরয়ী আহকামের অবশিষ্ট প্রকারগুলো দৃশ্যত দায়িত্বশীলের ইচ্ছাধীন হলেও মূলত এগুলো আইনদাতার ইচ্ছাধীন। আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি থেকে বের হয়ে এলেও এ ধরনের আহকাম আবার মানুষকে সেখানে ফিরিয়ে নেয়। কারণ সে কোনো 'ইবাহাত' (অনুমোদিত হুকুম) রহিত কিংবা পরিবর্তন করতে সক্ষম কিন্তু আইনদাতার বৃত্ত থেকে বের হবার কোনো অবকাশ তার নেই।

যে বিষয়টির ওপর ভর করে প্রবৃত্তি ও অভিসন্ধি বিন্যস্ত হয় সেটি হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার বিনাশ। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন, 'সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তাহলে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই।'[৭৪]

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রবৃত্তির অনুগামিতা তিনটি ধ্বংস নিশ্চিত করে। যেমন 'মুবাহ' জিনিসকে মুবাহ মনে করা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে মানুষের ইচ্ছাশক্তির আওতাধীন করতে বাধ্য করে না। তবে আইন প্রণেতার ইচ্ছা অনুযায়ী হলে স্বতন্ত্র কথা। এ অবস্থায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি আইন প্রণেতার ইচ্ছাশক্তির আওতাধীন থাকবে এবং শরয়ী অনুমতি থেকেই তার স্বার্থ গঠিত হবে।[৭৫]

যদি বলা হয়, শরীয়তের বিধান অনর্থক প্রণীত হয়েছে, তাহলে একথা সর্বৈব মিথ্যা। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা কি মনে করো তোমাদের আমি অনর্থক সৃষ্টি করেছি?'[৭৬]

তিনি আরো বলেছেন : 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং তাদের উভয়ের মাঝখানে যা আছে তাকে আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি এবং সত্য সহকারে এ দুটিকে আমি সৃষ্টি করেছি।'[৭৭]

যদি বলা হয়, শরয়ী বিধান জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণমূলক, তাহলে একথা ঠিক। এ কল্যাণ আল্লাহ অথবা মানবগোষ্ঠীর জন্য। আল্লাহর জন্য এ কল্যাণ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আল্লাহ বিশ্বজগতের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন, তিনি এর ঊর্ধে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই কল্যাণের উপকারিতা আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই কল্যাণের উপকারিতা বান্দার জন্য নির্ধারিত হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। আর মানবিক স্বার্থের দাবীও এটিই। কারণ প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের কল্যাণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উপযোগী কামনার প্রত্যাশা করে। শরীয়ত বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের এ লক্ষ অর্জনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই একথা কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে যে, মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাবী

অনুযায়ী শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছে?[৭৮] এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে : মানব কল্যাণ শরীয়ত প্রবর্তনের লক্ষ একথা যখন স্বীকৃত এবং এ কল্যাণ শরীয়তদাতার নির্দেশ অনুসারে বান্দার এবং তাঁরই নির্ধারিত সীমায় প্রত্যাবর্তন করে– বান্দার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাবী অনুযায়ী নয়– তখন শরীয়তের বিধানগুলো পালন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অভ্যাস, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা এ কথার সাক্ষ। কেননা আদেশ ও নিষেধমূলক বিধান মানুষকে তার অভিলাষ ও অভ্যাসের চাহিদা থেকে বের করে এনে শরীয়তের গণ্ডীর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এটিই আসল উদ্দেশ্য এবং এরূপ করা অভিলাষ ও প্রবৃত্তির সরাসরি বিরোধিতা।[৭৯]

অবশ্য বিধানের কল্যাণ বিধান পালনকারীর প্রতি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আরোপিত হওয়াটাই যথার্থ। এ থেকে অনিবার্যভাবে একথা বুঝায় না যে, সে এ কল্যাণ শরয়ী সীমার বাইরে অর্জন করবে। এ তত্ত্বটি আগের আলোচনার সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত হওয়াও বুঝায় না। কেননা আগের আলোচনায় আইনদাতার প্রবর্তন অনুযায়ী অংশ ও উদ্দেশ্য প্রমাণ করার কথা বলা হয়েছে, প্রবৃত্তি ও কামনার দাবী অনুযায়ী নয়। আর এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য।[৮০]

সর্বাবস্থায় দায়িত্বশীলদের কর্মতৎপরতা পরিমাপ করার জন্য যখন শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছে এবং মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন ও বিপর্যয় রোধ করা আইনদাতার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তখন এসব উদ্দেশ্য শরীয়তের বিধিবদ্ধ পন্থা ও শ্রমলব্ধ কর্মসূচি ছাড়া অন্য পন্থায় অর্জন করা যাবে না।

দায়িত্বশীল যখন শরীয়ত আনীত বিষয়ের বিরোধিতা করে তখন তার এ ধরনের কাজ শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী তৎপরতা হিসাবে গণ্য হবে। বিধানদাতার ইচ্ছাবিরোধী এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজই বাতিল, যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।[৮১]

শরীয়ত বিরোধী কাজ বাতিল হওয়ার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। কারণ মানব কল্যাণ সাধন ও ফিতনা ফাসাদ প্রতিরোধ করার জন্য শরয়ী বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। কাজেই যে কাজে মানুষের কল্যাণ নেই এবং যা অকল্যাণ প্রতিরোধেও সহায়ক নয়, তা বাতিল হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত কাজটি ভালো কি মন্দ তা নির্ণয় করে ভালো কাজটি করা এবং মন্দ কাজটি পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত পেশ করা দুরূহ ছিল। আলোচনার ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আইন প্রণেতা যখন অনেক কাজের মধ্যে এক ধরনের কাজকে কল্যাণের জন্য এবং অন্য ধরনের কাজকে অকল্যাণের জন্য নির্ধারণ করেছেন তখন কল্যাণের কারণের কথাও উল্লেখ করে কল্যাণমূলক কাজ করার নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে অকল্যাণের কারণ বর্ণনা করে অকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা মানুষের জন্য 'রহমত' এ কথাও বলেছেন।

অনুমতি প্রাপ্তির মাধ্যমে আইনদাতার যথার্থ ইচ্ছাই যখন দায়িত্বশীল মানুষের ইচ্ছা হয় তখন কল্যাণের কারণের মধ্যে যে ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটে তা পরিপূর্ণ ইচ্ছারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ

অবস্থায় এটি অর্জন করা অধিকতর উপযোগী। অন্যকে আইনদাতার যা ইচ্ছা নয় এমন বিষয়ের ইচ্ছা পোষণ করা অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনমূলক কাজ না হলে তা হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।[৮২]

দায়িত্বশীলের শরীয়ত বিরোধী কাজ বিধানদাতার ইচ্ছা বিরোধী কাজ রূপে গণ্য হওয়ার প্রমাণ হলো ঃ

এক. দায়িত্বশীল ব্যক্তি সাধারণভাবে আদেশদাতার অনিচ্ছাসূচক বিধানের ধারক হয়ে থাকে। এ ধরনের তৎপরতা মূলত অসাংবিধানিক কর্মধারার অংশ হিসাবে গণ্য। কারণ আদেশদাতা কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নির্দিষ্ট হুকুম প্রবর্তন করেছেন। দায়িত্বশীলের ইচ্ছা ঐ নির্দিষ্ট হুকুমের খেলাপ হলে প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাটি বিধিসম্মত হবে না। ইচ্ছা বা কাজ বিধিসম্মত না হলে কাজটি আদেশদাতার বিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় দায়িত্বশীল সম্পর্কে বলা হবে, যা করতে বলা হয়নি তাই সে করেছে এবং যা করতে বলা হয়েছে তা সে পরিত্যাগ করেছে। নিসন্দেহে এটা স্ববিরোধী কাজ।

দুই. দায়িত্বশীলের ইচ্ছা শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছাকে অর্থহীন গণ্য করা। আর অর্থহীন নিস্ফল ইচ্ছা শরীয়ত প্রণেতার গ্রহণীয় ইচ্ছা হতে পারে না। কারণ শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছার সারৎসার হলো দায়িত্বশীলের কল্যাণ করা। অথচ এ কল্যাণ বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে কল্যাণ নয়। শরীয়ত প্রণেতার দৃষ্টিতে যা অকল্যাণকর দায়িত্বশীলের সেটাকে অকল্যাণ মনে না করা শরয়ী আইনের সুস্পষ্ট পরিপন্থী।

তিন. আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা অনুসারে দায়িত্বশীলকে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কাজটি সে অনুযায়ী না হয়ে ব্যক্তির অভিলাষ চরিতার্থের উপকরণ হিসাবে সম্পাদিত হলে সে কাজ সত্যিকার অর্থে লক্ষ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এ অবস্থায় শরীয়ত প্রণেতার বিধানকে মতলব হাসিলের হাতিয়ার বানানোরই নামান্তর হবে। যেমন একজন মতলববাজ লোক অন্যের থেকে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে তার ভালো কাজগুলোকে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। বস্তুত দুনিয়ায় এ পথেই সব ধরনের বিপর্যয় ও ফিতনার আগমন হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু লোকের অস্তিত্ব দেখা যায় যারা শরীয়ত প্রণেতার বৈধ আইন-কানুনকে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের উপকরণ কিংবা শুধুমাত্র বৈধ বৈষয়িক ক্ষতিপূরণের আচরণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।[৮৩]

চার. এ ধরনের তৎপরতা বন্ধ হবার কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক প্রমাণ। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ 'কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হবার পর সে যদি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো, আর তা কত মন্দ আবাস!'[৮৪]

যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেননি তাকে লক্ষ-উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা এবং তার সাহায্যে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ রোধ করার ধারণা করা স্পষ্টত রসূলের বিরোধিতা। আর রসূলের বিরোধী প্রত্যেকটি কাজই তাঁর প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে তার বিরোধী

হওয়াই স্বাভাবিক। এ পর্যায়ে উমর ইবনে আবদুল আযীযের র. ভাষ্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরের শাসনকর্তাদের ঘষে মেজে শানিত করে গিয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহর কিতাবকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করেছিলেন এবং আল্লাহর দীনকে শক্তিশালী করেছিলেন। তাদের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী যে চলবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। যে তাদেরকে সাহায্য করবে তাকে সাহায্য করা হবে। আর যে এর বিরোধিতা করবে প্রকারান্তরে সে ঈমানদারদের ও আল্লাহর শাসকদের বিরোধী পন্থার অনুসারী হয়ে যাবে। তার চূড়ান্ত লক্ষ হবে নিকৃষ্ট জাহান্নাম।[৮৫]

আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী কাজ বাতিল হওয়ার হাদীস ভিত্তিক অপর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী : 'নিয়তের ওপর কাজ নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই তার ইচ্ছা বা নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফলাফল পাবে। কারো হিজরত বা দেশত্যাগ আল্লাহ ও রসূলের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় হলে সে সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুই পাবে। আবার কারো হিজরত বৈষয়িক কিংবা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে হলে সে তাই পেয়ে যাবে।'[৮৬]

তিনি স. আরো বলেছেন : 'আমাদের কাজের মধ্যে যে নতুন কিছু আরোপ করবে যা আগে ছিল না, তা হবে পরিত্যক্ত।' অন্য একটি হাদীসে বলেছেন : 'যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যার ওপর আমাদের কর্ম আরোপ করা যায় না তা হবে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য।'[৮৭]

উপরোক্ত হাদীস দুটি ইসলামের মহান মূলনীতির অন্যতম। 'নিয়তের ওপর কাজ নির্ভরশীল'-হাদীসটি বাতেন বা অপ্রকাশ্য কাজের মানদণ্ড। অন্যকথায় বলা যায়, যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা নিহিত থাকবে না সে কাজে সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায় না। এমনিভাবে যে কাজে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সম্মতি নেই সে কাজ পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য।

শেষ হাদীসের ভাষ্যে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যেসব কাজে শরীয়ত প্রণেতা তথা আল্লাহর সম্মতিসূচক নির্দেশ নেই তা পরিত্যাজ্য। এখানে নির্দেশের অর্থ হলো দীন ও শরীয়তের নির্দেশ। কাজেই ব্যক্তির প্রতিটি কাজই শরয়ী বিধানের আওতাভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধানাবলী মানুষের ওপর কর্তৃত্বশালী হতো। কাজেই মানুষের কাজ যখন শরয়ী বিধানের অন্তর্গত ও সমর্থনপুষ্ট হয় তখন তা গ্রহণীয় হয়। আর তা শরয়ী বিধানের বাইরে হলে অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত হয়।[৮৮] (অসমাপ্ত)

প্রমাণপঞ্জি

৪২. সূরা আন নহল, ৯০ নং আয়াত।
৪৩. সূরা আন নিসা, ৫৮ নং আয়াত।
৪৪. সূরা আল আনফাল, ২৪ নং আয়াত।
৪৫. সূরা আন নহল, ৯৭ নং আয়াত।
৪৬. সূরা আল বাকারা, ২০৪-২০৫ নং আয়াত।
৪৭. সূরা আল বাকারা, ৬ নং আয়াত।
৪৮. সূরা আল মায়েদা, ৬ নং আয়াত।
৪৯. সূরা আল বাকারা, ১৭৯ নং আয়াত।
৫০. সূরা আল বাকারা, ২১৯ নং আয়াত।

৫১. সূরা আল মায়েদা, ৯১ নং আয়াত।
৫২. সুনান আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।
৫৩. বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এখানে শব্দগুলো উদ্ধৃত হয়েছে মুসলিম থেকে।
৫৪. তাবারানী মু'জামে এবং আবু-ইয়ালা তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।
৫৫. ইবনে মাজা, দারে কুতনী এবং অন্যান্য গ্রন্থ। ইবনে আছীর, আন নেহায়াতু ফীগারীবিল হাদীস, আদ্ দারার ওয়াদ্ দিরার অর্থ, ৩ খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।
৫৬. ইবনে আবদুস সালাম, কাওয়ায়েদুল আহকাম, ১ খণ্ড, ২২-২৩ পৃষ্ঠা।
৫৭. বুখারী আবু হুরাইরা রা. থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।
৫৮. সূরা আন নিসা, ৩১ নং আয়াত।
৫৯. সূরা আন নজম, ৩২ নং আয়াত।
৬০. তাফসীর ফখরুর রাহী, ৩ খণ্ড, ২০৬-২০৯ পৃষ্ঠা।
৬১. ই'লামুল মুকিয়ীন, ২ খণ্ড, ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠা, কাওয়ায়েদুল আহকাম, ১ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, ডক্টর মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আল বূতী, যাওয়াবিতুল মাসলিহাত, ৮১ পৃষ্ঠা।
৬২. ই'লামুল মুকিয়ীন, ২ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা এবং কাওয়ায়েদুল আহকাম, ১ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।
৬৩. ই'লামুল মুকিয়ীন, ২ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।
৬৪. যাওয়াবিতুল মাসলিহাত, ৮১ পৃষ্ঠা এবং কাওয়ায়েদুল আহকাম, ২ খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।
৬৫. ঐ
৬৬. বুখারী।
৬৭. শিফাউল গালীল, ১০৩ পৃষ্ঠা।
৬৮. কাওয়ায়েদুল আহকাম, ২ খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।
৬৯. আল মাওয়াফিকাত, ১২ পৃষ্ঠা।
৭০. শায়খ ঈসা মান্নূক, নিবরাসুল উকূল, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮ পৃষ্ঠা, শাইখ মুহাম্মদ আনীস উবাদাহ, মাকাসিদুশ শারীয়াহ, ১০ পৃষ্ঠা।
৭১. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।
৭২. ঐ
৭৩. ঐ
৭৪. সূরা আল মুমিনূন, ৭১ নং আয়াত।
৭৫. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১২২-১২৩ নং আয়াত।
৭৬. সূরা আল মুমিনূন, ১১৫ নং আয়াত।
৭৭. সূরা আদ্ দুখান, ৩৮-৩৯ নং আয়াত।
৭৮. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১২৩ নং আয়াত।
৭৯. ঐ
৮০. ঐ
৮১. ঐ এবং জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা।
৮২. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ৫১ পৃষ্ঠা, ই'লামুল মুকিয়ীন, ৩ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা এবং ২ খণ্ড, ১২৩, আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।
৮৩. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা। কাররাফী, আল ফুরুক, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।
৮৪. সূরা আন নিসা, ১১৫ নং আয়াত।
৮৫. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা।
৮৬. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে ইমাম বুখারী হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।
৮৭. বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েত এবং রেওয়ায়েতের শেষ অংশটুকু মুসলিমের।
৮৮. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা এবং ১০ ও ১১ পৃষ্ঠা, মুসলিমের উপর ইমাম নববীর শরাহ, ১৩ খণ্ড, ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ৫৪-৬৭

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

ছয়

গালি-গালাজ হুমকি-ধমকি সম্পর্কে এর আগে যা বলা হয়েছে, তা এমন সব অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ কিংবা কারো অধিকারের উপর অনধিকার চর্চা করা হয়। একথা আমরা নাবালেগ অপরাধীর ক্ষেত্রেও বলতে পারি। দাবী করা যেতে পারে এই নাবালেগের কৃত অপরাধ অন্যের অধিকারের উপর নির্জলা হস্তক্ষেপ। কেননা নাবালেগ বালক-বালিকা শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত নয়, তাদের ওপর কোন হককুল্লাহ কার্যকর নয়। বস্তুত ছোট বালকও যদি অপরাধ করে তবে তা অবশ্যই সামাজিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের পর্যায়ে পড়ে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে নাবালেগ শিশুদের অপরাধেরও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া জরুরী, যাতে ভবিষ্যতে সে পেশাদার অপরাধীতে পরিণত না হয় এবং অপর শিশুরাও অপরাধপ্রবণ শিশুকে দেখে অপরাধ কর্মে উৎসাহিত না হয়।

'গায়রে মুকাল্লাফ' (শরীয়তের দণ্ডাদেশ প্রয়োগের আওতামুক্ত) হওয়ার কারণে আমরা যদি শিশুদের অপরাধকে সম্পূর্ণ বিবেচনায় না নেই, তাহলে সেটি শুধু সেই অপরাধী শিশু ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যেই ক্ষতিকর হবে না, গোটা সমাজের জন্যেও ক্ষতির কারণ ঘটবে।

এমনটি কিভাবে ভাবা যায় যে, যে নাবালেগ শিশু ব্যভিচার, চুরি কিংবা ছিনতাই ডাকাতির মতো অপরাধ করলো অথচ তাকে সামাজিকভাবে অপরাধী বলেই গণ্য করা হবে না? এমনটি ভাবা হবে আইনের ভুল ব্যাখ্যা। পূর্ণবয়স্ক অপরাধীর অপরাধ যেমন আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ তেমনি নাবালেগ শিশুর অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। পার্থক্য শুধু এতটুকু, শিশু অপরাধীদের উপর সুনির্দিষ্ট শাস্তি যেমন হদ, কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা এসব শাস্তি প্রয়োগের জন্যে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার শর্ত রয়েছে। অবশ্য কোন শিশু যদি শরীয়তের সুনির্দিষ্ট শাস্তিসমূহের মতো কোন গুরুতর অপরাধ করে, অথবা সুনির্দিষ্ট তাযিরী অপরাধসমূহের মধ্যে কোন অপরাধ করে তাহলে তার অপরাধের মাত্রা ও উপযুক্ততা বিচার করে সংশোধনমূলক কোন শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নেই। এ ব্যাপারটিতে কোন সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নাবালেগদের যে সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া হয় তা তাযিরের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাযির প্রকৃতপক্ষে সংশোধন ব্যবস্থা। এই মূলনীতি যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে যারা বলেন, নাবালেগ শিশুদের শাস্তি শুধু ব্যক্তি

অধিকার খর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাদের কথার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। বস্তুত আমার মত হলো, কোন অপরাধ এমন নেই নিরেট ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের জন্যে যেখানে তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয়। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, অনেক অপরাধে সামাজিক অধিকারের চেয়ে ব্যক্তি অধিকার প্রাধান্য থাকে, সেসব ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ হয় ব্যক্তি অধিকার হরণের জন্যে, সামাজিক অধিকারের হরণের জন্যে নয়। এ কথা যদি মেনে নেয়া যায় তাহলে এর পরিণতি হবে এই যে, সমাজ কোন কোন অপরাধের শাস্তি প্রয়োগে অক্ষম হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতিতে অপরাধীরা যে কোন ধরনের অপরাধ সংঘটনের মতো দুঃসাহস পাবে, সেই অপরাধে ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘিত হোক কিংবা সামাজিক অধিকার লঙ্ঘিত হোক তা অপরাধীরা বিচার করবে না। বস্তুত এটি সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে উঠবে যা ইসলামী শরীয়তের মূল চেতনা ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে ফকীহ আলমাওয়ার্দী তাঁর কিতাব 'আহকামুস সুলতানিয়ায় লিখেছেন, 'ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের কারণে যদি কোন তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দেয় যেমন গালি-গালাজ কিংবা মারপিটের মতো ঘটনায়, তারপরও শাসকের এই অধিকার রয়েছে অপরাধীর মেজাজ বুঝে তিনি শাস্তি প্রয়োগ করবেন কিংবা ক্ষমা করে দেবেন। কেননা এ ধরনের অপরাধে সর্বাবস্থায় শাসকের শাস্তি প্রয়োগের অধিকার থাকে। এ ব্যাপারটি তখন ঘটে যখন বিষয়টি আদালতে চলে যায় আর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে দেয়।' অপরাধ আদালতে গড়ানোর আগেই যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় তবে এ ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর শাস্তি প্রয়োগের অধিকার রয়েছে কি-না এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সঠিক কথা হলো, এ পর্যায়েও শাসকের হস্তক্ষেপ ও শাস্তি প্রয়োগের অধিকার বহাল থাকবে। বাদীরা অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেও শাসক প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন। কেননা শাসকদের হস্তক্ষেপ ব্যাপক কল্যাণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কোন একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার দ্বারা শাসকের অধিকার রহিত হয়ে যায় না।[১]

এ কথা যখন সাব্যস্ত হলো অপরাধ যে ধরনেরই হোক না কেন, তার শাস্তি প্রয়োগের অধিকার সমাজের রয়েছে, তখন এই নীতির ভিত্তিতে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে অপরাধীদের পাকড়াও করা, তাদের শাস্তি দেয়া সর্বাবস্থায়ই একটি সামষ্টিক সামাজিক কর্তব্য। কেননা সমাজের মধ্যে যে অপরাধ সংগঠিত হয় তা অবশ্যই সমাজের মূলভিত্তিকে আঘাত করে এবং তাতে সমাজের অধিকার খর্ব হয়। উপরে বর্ণিত মূলনীতি থেকে এই বিধান বের হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করা এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ফরিয়াদের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া, অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া অথবা কোন আপস-মীমাংসা করার অধিকার সংরক্ষিত নয় বরং শাস্তি প্রয়োগ সেই প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাধীন যে প্রতিষ্ঠান সমাজের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার দায়িত্ব বহন করে। বরঞ্চ নিরঙ্কুশ ক্ষমা নির্ভর করবে সমকালীন শাসকের ওপর। শাসক তখনই ক্ষমা করতে পারবেন যখন তার কাছে ক্ষমা করে দেয়াটা শাস্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশি কল্যাণকর মনে হবে।[২]

অবশ্য মজলুম ব্যক্তি যদি জালেমকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তার এই ক্ষমা আদালতের নির্ধারিত শাস্তিকে প্রভাবিত করবে, এই মূলনীতি এ ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সেই সাথে উল্লেখিত মূলনীতি এ বিষয়টিতে বাধা সৃষ্টি করে না যে আইন প্রয়োগ কিংবা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কিছু অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজলুমের অভিযোগকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করবেন এবং এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে বিচার কার্যক্রমের দাবী শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই করতে পারবে।[৩]

গ্রন্থকার বলেন, আমার অভিমত হলো, তাযিরের ক্ষেত্রে হককুল্লাহ ও হককুল ইবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে কোন বিশিষ্টতা নেই। আমার এ মতের পক্ষে যেসব জিনিস সমর্থন যুগিয়েছে সেগুলো হলো, আল্লাহর অধিকার ও ব্যক্তি অধিকারের পার্থক্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ যেসব সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে এগুলোতে উলামা ও ফকীহগণের মধ্যে ব্যাপক মতভিন্নতা রয়েছে। মতভিন্নতার কারণে এই পার্থক্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

আগে আমি একথা পরিষ্কারভাবে বলেছি, যে কোন অপরাধেই অপরাধীকে প্রশাসন শাস্তি দিতে পারে। অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকারের প্রভাব যতো বেশিই হোক না কেন সে যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় তবুও প্রশাসনের শাস্তি প্রয়োগে এই ক্ষমা কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমা, মীমাংসা, সন্ধি কিংবা নিরপরাধ ঘোষণা কোনটাই প্রশাসনের শাস্তি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অধিকাংশ ফকীহগণেরও এদিকেই ঝোঁক যে, ব্যক্তি অধিকার হরণের কারণে যে শাস্তি ওয়াজিব হয় এটির শাস্তি প্রয়োগের অধিকার প্রশাসনের রয়েছে। হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যেমন শাস্তি প্রয়োগের অধিকার প্রশাসনের আছে। কোন কোন ফকীহ এ কথাও বলেছেন যে, ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে তাযিরী শাস্তি ওয়াজিব হয় এর মধ্যেও একত্রীকরণ (AMALGAMATION) হতে পারে হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হওয়া তাযিরের মধ্যেও শাস্তি একত্রীকরণের অবকাশ আছে।

ব্যক্তি অধিকার হরণের অপরাধে যে শাস্তি সাব্যস্ত হয় তাতে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা কার্যকর কিন্তু হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তি দানের দাবী উত্তরাধিকারদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় না। বস্তুত এর মূল কথা হলো, অপরাধী যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে উভয় ধরনের অপরাধের দায়-দায়িত্ব উত্তরাধিকারের কাঁধে বর্তায় না। কেননা শাস্তি তো সেই ব্যক্তিকে দেয়া হয় যে অপরাধী। উভয় প্রকারই তাযিরী শাস্তির আওতায় পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাহলে শাস্তি দানের দাবীর অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এ ক্ষেত্রেই শুধু একটু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। কেননা উভয় ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা প্রশাসনের। কেননা মজলুমের উত্তরাধিকারীগণ যদি অপরাধীকে ক্ষমাও করে দেয় তবুও প্রশাসনের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রহিত হয়ে যায় না। প্রশাসন প্রয়োজনবোধ করলে শাস্তি দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, অধিকার স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনা শুধু সম্পদের ক্ষেত্রে ঘটে। (RIGHTS

WHOSE VALUE CAN BE EXPRESSED IN MONEY) আর আর্থিক অধিকারের সাথে সবচেয়ে বেশি কযফের সামঞ্জস্য রয়েছে। হানাফীদের মতে, হদ্দে কযফে'র অধিকার উত্তরাধিকারদের প্রতি স্থানান্তরিত হওয়া নাজায়েয। যারা হদ্দে কযফ স্থানান্তরযোগ্য মনে করেন, তাদের মতেও শুধু সে ক্ষেত্রে হদ্দে কযফের অধিকার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে যখন মিথ্যা অপবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য কথায় বলা যায়, যদি তারাও এই অপবাদে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে তাদের শাস্তি দাবী তারা করতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, হদ্দে কযফে এ শাস্তির অধিকার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু এটা কোন একক উত্তরাধিকারীর মধ্যে হয় না, অল্প বিস্তর সকল উত্তরাধিকারীর মধ্যে এটি সমভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু পরিত্যক্ত সম্পদের মতো এটি বণ্টিত হয় না। বস্তুত হদ্দে কযফের ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য তাযিরযোগ্য অপরাধের ক্ষতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। এর একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা যাবে না।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি, তাযির হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে হোক আর ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে হোক উভয় অবস্থায় সেটি সাধারণ ফৌজদারী আইনের পর্যায়ভুক্ত। ফৌজদারী আইনে এগুলো হদ-এর চেয়ে ভিন্ন নয়। কেননা উভয় প্রকার তাযির অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় একই। সামান্য তারতম্যের কারণে এগুলোকে বিশেষভাবে আলাদা করা অর্থহীন।

হদ কিসাস ও তাযিরের মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক

হদ ও কিসাসের এবং হদ ও তাযিরের বিধানের মধ্যে কয়েক পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে তন্মধ্যে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

১. ইসলামী শরীয়তে হদ ও কিসাসের অপরাধীর ক্ষেত্রে বিচারককে এই স্বাধীনতা দেয়া হয়নি যে বিচারক তাঁর বিবেচনা মতো শাস্তি নির্ধারণ করবেন অথবা শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। শরীয়ত এসব অপরাধের শাস্তি পূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এগুলোর সীমারেখা একই। যার ফলে এগুলোকে হদ বলা হয়। অবশ্য হদ পর্যায়ভুক্ত কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলোর সীমারেখা দু'ধরনের হতে পারে, যেমন কোড়া মারার শাস্তি। এ ক্ষেত্রে বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, অপরাধী প্রকৃতপক্ষেই অপরাধ সংঘটন করেছে তাহলে বিচারককে অবশ্যই শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি দিতে হবে। এক্ষেত্রে শাস্তির মধ্যে কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকার বিচারকের নেই। অথবা শাস্তি মওকুফ করার অধিকারও বিচারকের থাকবে না। এ ধরনের অপরাধে অপরাধীর অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকতা নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে কোনই প্রভাব ফেলবে না। যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবিকই চুরি কর্মে জড়িত ছিল, এই প্রমাণ সাক্ষীর দ্বারা হোক কিংবা স্বীকারোক্তির দ্বারা হোক, তাহলে বিচারকের কর্তব্য চোরের

হাত কাটার নির্দেশ দেয়া। অপরাধ যদি তার সকল শর্তাবলী ও (INGREDIENTS) আরকানসহ প্রমাণিত হয়, তাহলে অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা যাই থাকুক, হাত কাটার শাস্তিই কার্যকর হবে। জেনে বুঝে হত্যার অভিযোগ যদি অকাট্য প্রমাণসহ বিচারকের কাছে প্রমাণিত হয়, তাহলে বিচারকের কর্তব্য অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া।

কিসাস ও হদের মধ্যে পার্থক্য হলো, কিসাসের ক্ষেত্রে যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা রক্ত সম্পর্কের অভিভাবক শাস্তি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বিচারকের কর্তব্য হলো কিসাসের নির্দেশ ঘোষণা না করা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিচারকের এই অধিকার রয়েছে তিনি প্রয়োজনবোধ করলে অপরাধীকে এক বা একাধিক তাযিরী শাস্তি দিতে পারেন। এ পার্থক্যের মূল কারণ হলো, হদ আল্লাহর হক লঙ্ঘনের অপরাধে কার্যকর হয় এবং কিসাস মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয়। যার ফলে ক্ষতিগস্ত ব্যক্তিবর্গের অধিকার রয়েছে তারা ইচ্ছা করলে শাস্তি কার্যকর করার দাবী করতে পারে। পক্ষান্তরে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিয়ে শাস্তির দাবী প্রত্যাহারও করতে পারে।

তাযিরাতের পর্যায় হদ ও কিসাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী শরীয়ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে কি কাজ অপরাধ (CRIMES)। সেই সাথে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে। ব্যাপক তদন্ত ও অনুসন্ধানে বিচারকের কাছে যদি কোন অপরাধ তাযিরী শাস্তি বলে প্রমাণিত হয়, আর এই তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণ যদি সঠিক বলে বিচারক মনে করেন, তাহলে অপরাধ ও অপরাধীর পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারক তাযিরী শাস্তিসমূহ থেকে যে কোন একটি কিংবা একাধিক শাস্তির সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিচারককে ব্যাপক স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়া রয়েছে। বিচারকের এই স্বাধীনতাও রয়েছে যে, শাস্তি ঘোষণার সময় তিনি অপরাধীর মনোভাব, তার প্রতিক্রিয়া, তার ব্যক্তিত্ব ও তার পূর্বাপর কার্যক্রম এবং শাস্তির পর অপরাধীর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করবেন। সেই সাথে বিচারককে এই অধিকারও দেয়া হয়েছে, শাস্তি ঘোষণার সময় তিনি অপরাধের পর্যায় এবং সমাজে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াও বিবেচনা করবেন। এক্ষেত্রে বিচারক যে কোন একটি তাযিরী শাস্তিও দিতে পারেন আবার কয়েকটি শাস্তিও একসাথে দিতে পারেন। বিচারকের এই স্বাধীনতাও রয়েছে যে, শাস্তির সবচেয়ে নিম্ন পর্যায় ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের মাঝামাঝি কোন শাস্তি ঘোষণা করবেন, যা অপরাধী ও অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই সাথে বিচারক এই অধিকারও রাখেন, তিনি শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিতে পারেন কিংবা শাস্তি মওকুফ রাখার নির্দেশও দিতে পারেন।

স্বাভাবিকভাবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিচারককে যেসব স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এগুলো তাকে স্বৈরাচারে পরিণত করবে। কারণ তার স্বাধীনতা ও অধিকারগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি নেই। সেই সাথে অভিযুক্তদের অধিকার রক্ষার কোন বিধানও এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এর ফলে এই আশংকা রয়েছে বিচারক স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের বশীভূত হয়ে কোন অবিচার না করলেও তার অনিচ্ছা কিংবা ভুলে অভিযুক্তের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই আশংকা ভিত্তিহীন। বরং ইনসাফ

প্রতিষ্ঠার জন্যে এই পদ্ধতিই বেশি উপযোগী। এই পদ্ধতিতেই সব ধরনের অপরাধে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা সম্ভব। ইসলামী শরীয়ত প্রকৃত অপরাধগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যদিও এই নির্দিষ্টকরণ ব্যাখ্যা সাপেক্ষে কিন্তু অপরাধ নির্ণয়ের জন্যে এমন পদ্ধতি রয়েছে যা দ্বারা যে কোন অপরাধের শাস্তি বিধানে ত্রুটিমুক্ত থাকা সম্ভব। ইসলাম তাযিরী অপরাধগুলোর শাস্তিও সবিস্তারে বলে দিয়েছে যেগুলোর আমরা সামনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবো। এক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। শরীয়ত যেসব কর্মকাণ্ডকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে বিচারক তদন্ত ও শুনানি অনুষ্ঠানের পর সেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত তাযিরী শাস্তিসমূহ থেকে অপরাধের উপযোগী কোন শাস্তি নির্ধারণ করবেন। বস্তুত শরীয়ত কোন ব্যক্তিকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করার জন্যে কিছু শর্তারোপ করেছে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে এগুলো বিবেচনা করতে হবে। বিচারক নিয়োগের শর্তগুলোর অন্যতম একটি হলো, বিচারকের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে অর্থাৎ বিচারক ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় আহকাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ইলম ও অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতিতে শরীয়তের বিধান মতো ফয়সালা নির্ধারণের উপযুক্ত মেধা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন।

সারকথা হলো, হুদুদ ও কিসাসের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তির জন্যে একটা অপরিবর্তনীয় সীমা রয়েছে, অপরাধীর অবস্থা যে ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু তাযিরী শাস্তির ক্ষেত্রে যে সীমারেখা দেয়া হয়েছে তা পরিবর্তনযোগ্য ও নমনীয়। এক্ষেত্রে অপরাধী ও অপরাধ উভয়টির মাত্রা অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি শাস্তির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ফয়সালার সময় এসব ব্যাপারকে বিবেচনায় রাখতে হয়।[৫]

২. হদ অবশ্য প্রয়োগযোগ্য ওয়াজিব। কোন অবস্থাতেই এক্ষেত্রে ক্ষমা করা, মওকুফ করা, সুপারিশ কিংবা নিরপরাধ ঘোষণা করার অবকাশ নেই। কিসাসও অনুরূপ। কিসাসের ক্ষেত্রে সমকালীন শাসক, প্রশাসক কিংবা বিচারকের ক্ষমা, সুপারিশ, শাস্তি মওকুফ কিংবা নিরপরাধ ঘোষণা করার অধিকার নেই। কিন্তু তাযির এ দুটির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তাযির যদি হককুল্লাহ লঙ্ঘনের কারণে ওয়াজিব হয় তাহলে আইনের চাহিদা হলো তাযির বাস্তবায়ন জরুরী। কিন্তু বিশেষ কল্যাণের স্বার্থে অথবা অপরাধীর যদি শাস্তি ছাড়া সংশোধনের সুযোগ থাকে তাহলে সমকালীন শাসকের অধিকার রয়েছে এই শাস্তি মওকুফ করার কিংবা অপরাধীকে ক্ষমা করার। সেই সাথে বিচারকের কাছে প্রশাসক অপরাধীর পক্ষে সুপারিশও করতে পারেন। আর যদি তাযির ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের অপরাধে ওয়াজিব হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার থাকে। সেই সাথে অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার বিনিময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোন কিছু গ্রহণও করতে পারে। ব্যক্তি অধিকার বিনষ্টের শাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীর ওপর নির্ভরশীল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি শাস্তি প্রয়োগের দাবী করে সেক্ষেত্রে শাসক না ক্ষমা করতে পারেন, না ক্ষমার সুপারিশ কিংবা শাস্তি মওকুফের নির্দেশ দিতে পারেন।[৬]

এ পার্থক্য ও ব্যবধানের মূলভিত্তি হলো, হুদুদ শুধুমাত্র আল্লাহর হক লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় আর কিসাস ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয়। কিন্তু তাযির দু'প্রকার। একটি হককুল্লাহ অপরটি হককুল ইবাদ।

৩. জমহুর ফুকাহার মত হলো, হদ ও কিসাসের অপরাধ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হবে নয়তো অপরাধীর স্বীকারোক্তির দ্বারা। সাক্ষী ও স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো অবশ্যই সাক্ষী ও স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে থাকতে হবে। এ সব অপরাধের বেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা বাদীর কোন সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। বাদীর কোন শোনা কথায় সাক্ষ্য দেয়া (HEARSAY EVIDENCE) যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না তেমনি তার হলফ ও নারীর সাক্ষ্যের উপরও ফয়সালা দেয়া যাবে না। সাক্ষ্যের ব্যাপারেও হককুল্লাহ ও হককুল ইবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যার অবকাশ ও পার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।[৭]

৪. ইমাম শাফেয়ীর র. মতে হদ ও তাযিরের মধ্যে এটিও একটি পার্থক্য যে, হদ বাস্তবায়নের সময় দুর্ঘটনাজনিত কারণে যদি নির্দিষ্ট শাস্তির চেয়ে বেশি কোন ক্ষতি হয়ে যায় তবে এটির জন্য কোন শাস্তি হয় না। কিন্তু তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের সময় যদি কোন অপরাধী ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা আসল শাস্তি র চেয়ে বেশি বলে গণ্য হয় তবে সেটির জন্য (DAMAGES) জরিমানা দেয়া ওয়াজিব। এ মতের পক্ষে ইমাম শাফেয়ী হযরত উমর রা. এর কাজকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। একবার কোন একটি মোকাদ্দমায় একজন মহিলাকে তিনি ধমক দেন। এতে আতংকিত হয়ে মহিলা তার পেট সংকুচিত করে এবং এভাবে গর্ভপাত হয়। এ ঘটনায় হযরত উমর হযরত আলীর সাথে পরামর্শ করে গর্ভপাতের দিয়্যত আদায় করেন। অবশ্য এখানে মতবিরোধ রয়েছে, এধরনের দুর্ঘটনার দিয়্যত কে আদায় করবে? কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যে শাসকের হুকুমে এই ক্ষতি হয়েছে তার অকিলারা[৮] এই দিয়্যত আদায় করবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, দিয়্যত আদায়ের ভার বহন করবে সরকারী ট্রেজারী তথা বায়তুল মাল।

ইমাম আবু হানিফা র., ইমাম মালেক র. ও ইমাম আহমদ র. বলেন, শাসক যার উপর হদ অথবা তাযির জারী করবেন তার যদি মৃত্যু ঘটে তবে এই মৃত্যুর দায় কারো উপর বর্তাবে না। কেননা হদ ও তাযির উভয় ক্ষেত্রে সমকালীন শাসক আইনের বিধান প্রয়োগের জন্য আদিষ্ট। বস্তুত আদিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর এ দায় চাপানো যায় না যে, নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে অজান্তে কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাতে কোন ক্ষতি হবে না। লেখক বলেন, আমার মতে এই মতটিই গ্রহণযোগ্য। অন্য মত যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে দেশের শাসক ও দায়িত্বশীলদের জন্যে অপরাধের মোকাবেলা করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করা এবং অস্থিতিশীলতা মুক্ত রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রশাসন অপরাধীদের কাছে অসহায় ও অকার্যকর হয়ে যাবে।[১০]

৫. হদ ও তাযিরের মধ্যে পার্থক্য এও রয়েছে যে, নাবালেগের ওপর হদ ওয়াজিব হয় না। কারণ হদ প্রয়োগের জন্যে অপরাধীর বালেগ হওয়া শর্ত। কিসাসের ক্ষেত্রেও একই শর্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে

তাযিরী শাস্তি নাবালেগের উপরও প্রয়োগ হয়। কেননা তাযিরী শাস্তির উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। বস্তুত শিশু ও বালক বালিকাদেরকে সংশোধনমূলক শাস্তি দেয়া জায়েয।[১১] অবশ্য কোন কোন ফকীহ এমতও ব্যক্ত করেছেন, তাযিরী শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধীর বালেগ হওয়া শর্ত।[১২]

শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানগর্ভ কর্মনীতি

কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়ার কৌশল

দৃশ্যত মনে হয় ইসলামী শরীয়ত যেসব অপরাধের বিশেষ শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন হ্রাস বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়নি। এগুলো এমন অপরাধ যেগুলোর ভয়াবহতা সম্পর্কে জাতি, ধর্ম ও অঞ্চল ভেদে কোন মানুষের মধ্যেই দ্বিমত নেই। কোন সমাজেই মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে না যদি তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা সম্পূর্ণ নির্মূল না হলেও অন্তত কম পর্যায়ে না থাকে। ইসলামী শরীয়ত যে সব অপরাধে হদ সাব্যস্ত করেছে বস্তুত এসব মারাত্মক অপরাধ থেকে সমাজকে মুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী, যাতে সমাজ স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারে। এসব অপরাধ সমাজের মূল ভিত্তিকে ধসিয়ে দেয়। এসব অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সমাজের মূল ভিত্তিগুলো সংরক্ষণের জন্যে জরুরী। এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজের স্থিতি ও শান্তি এবং সমাজের মান-সম্মানও এগুলোর নিয়ন্ত্রণের উপরই নির্ভর করে।

নির্দিষ্ট শাস্তিমূলক অপরাধ বিভিন্ন ধরনের। কিছু কিছু অপরাধ এমন যেগুলো মানুষের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করে। যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড। আর কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলো মান-সম্মানের ওপর আঘাত হানে, যেমন ব্যভিচার ও অপবাদ। কিছু অপরাধ এমন যেগুলো অপর মানুষের সহায় সম্পদে হস্তক্ষেপ করে, যেমন চুরি ও ডাকাতি। আর কিছু অপরাধ মানুষের মেধা ও জ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেমন মদ্যপান। কিছু এমন অপরাধ রয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, যা প্রশাসনিক স্থিতি ও আইন-শৃংখলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর যেমন বিদ্রোহ, আইন অমান্য। আর কিছু অপরাধ এমনও আছে যা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন ধর্মদ্রোহিতা ইরতিদাদ বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া।[১৩]

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইসলামী শরীয়ত মানুষের জীবন, সমাজ গঠনের মৌলিক কোষ হিসাবে বিবেচিত তার পারিবারিক ব্যক্তিগত সম্পদের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও আইন-শৃংখলা যার ওপর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল এর ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত এই মৌলিক বিষয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষতি করতে পারে এমন অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছে এবং এগুলোর শাস্তির ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যাতে এসব অপরাধকে মূল শিকড়সহ উপড়ে ফেলা যায়। এসব অপরাধের শাস্তি প্রদানের সময় ইসলামী আইন অপরাধীর ব্যক্তিগত অবস্থা ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে না। যাতে এসব অপরাধে নির্মূলের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হতে পারে এবং সাধারণ মানুষ এসব অপরাধ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

সাধারণ অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট না করার কারণ

ইসলামী শরীয়ত কিছু সংখ্যক গুরুতর অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়ে অপরাপর অপরাধের শাস্তি অনির্দিষ্ট রেখেছে। এটা এমন এক দূরদর্শী ব্যবস্থা যার ফলে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা স্থান কাল ও পাত্রভেদে সকলের জন্যে সকল সময়ে ও সমান ভাবে কার্যকর এবং প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্যে সেই যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমকালীন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের এসব আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার তথা কঠোর নমনীয় কিংবা হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে। যদি প্রথম যুগেই শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো তাহলে পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়তো তা যথার্থ বিবেচিত হতো না। সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে না দেয়ার মধ্যে জনগণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যাতে সবযুগের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ সময় উপযোগী আইন সংস্কার করে নিতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী শরীয়ত যুগোপযোগিতার সাথে সাথে সব ধরনের যুগ চাহিদার প্রয়োজন পূরণ করে আপন মহিমায় জীবন্ত রয়েছে।

কিসাসকে ব্যক্তি অধিকারভুক্ত করার কারণ

প্রশ্ন হতে পারে ইসলামী শরীয়ত কিসাসকে ব্যক্তি অধিকারভুক্ত করেছে কেন? আর ব্যক্তিকে কেন এই অধিকার দিয়েছে যে, ইচ্ছা করলে মানুষ কিসাস ক্ষমা করে দিতে পারে? এর কারণ হলো, স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য যেসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয় সেগুলো দুই ধরনের সীমালঙ্ঘনের কারণে ঘটে থাকে। প্রথমত সীমালঙ্ঘন সেই ব্যক্তির উপর করা হয় যাকে হত্যা করা হয় অথবা যার কোন অঙ্গহানী করা হয়। দ্বিতীয়ত সীমালঙ্ঘন করা হয় সমাজ ব্যবস্থার ওপর যে ব্যবস্থার ওপর সমাজের শান্তি নিরাপত্তা নির্ভরশীল এবং সমাজের মানুষের জীবন ও সম্পদ যাতে নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকে, যাতে মানুষ একে অন্যের উপর হস্তক্ষেপ করতে না পারে। এই প্রকারের সীমালঙ্ঘনের মধ্যে সামাজিক অপরাধের চেয়ে ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ বেশি ক্ষতিকর। কারণ কারো নিহত হওয়া কিংবা অঙ্গহানীর শিকার হওয়ার মতো ঘটনাগুলো ঘটে থাকে সাধারণত দু'পক্ষের মধ্যে কোন শত্রুতা অথবা ঝগড়া ফাসাদের কারণে। এই কারণটা সীমিত, ব্যাপক নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই হয় লক্ষ, সমাজের ক্ষতি এক্ষেত্রে অপরাধীর লক্ষ হয় না। প্রতিপক্ষের ওপর যদি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি সুযোগ পায় তখন তার ক্ষতি করে, সুযোগ না পেলে সমাজের অন্য কারো উপরে আঘাত হানে না। ফলে এধরনের অপরাধে ক্ষয়ক্ষতিটা একান্ত ই আক্রান্ত ব্যক্তিরই হয়ে থাকে।

হদ ও কিসাসের অপরাধের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য

কোন অপরাধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় হদ ও কিসাসের হত্যাকাণ্ড থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন ডাকাতির সময় যে হত্যাকাণ্ড ঘটে। কারণ ডাকাতির মধ্যে অপরাধীর মূল লক্ষ থাকে ধন সম্পদ কুক্ষিগত করা। ফলে ডাকাতি ও দস্যুতায় ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক। কেননা ডাকাতির সম্পর্ক থাকে ধন সম্পদের সাথে, আর ধন সম্পদ সঙ্গতি অনুযায়ী কমবেশি প্রত্যেক মানুষের কাছেই থাকে। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে খুন করা ডাকাতের উদ্দেশ্য থাকে না, তাদের টার্গেট

হয় সবাই যাদের কাছে সম্পদ থাকে। ফলে তাদেরকেই ডাকাত ও দস্যুরা হত্যা করে যাদেরকে তারা সম্পদ ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে বাধা মনে করে।

চুরির ব্যাপারটিও অনুরূপ। চোরের লক্ষ থাকে সম্পদ চুরি করা। একজনের কাছে সম্পদ না পেলে সে অন্যের সম্পদে হাত বাড়ায়।

চোর যখন চুরি করে তখন সে যার সম্পদ চুরি করে সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু চোরাইকৃত জিনিসের মধ্যে চুরির ক্ষয়ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকে না। সম্পদশালী ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদও চুরি হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। কোন একটা চুরির ঘটনা ঘটলে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যেও চুরির আতঙ্ক ছড়িয়ে-পড়ে। এ দৃষ্টিতে চুরি একটা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে।

অনুরূপ ব্যভিচারও একটি ব্যাপক ক্ষতিকর অপরাধ। কোন ব্যভিচারীর যদি নির্দিষ্ট নারীর সাথেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ থাকে তবে অনেকের মধ্যে এই আশঙ্কাও দেখা দেয় যে, সে যদি নির্দিষ্ট নারীকে ভোগ করতে না পারে তবে অন্যের উপরও আঘাত হানতে পারে। এ কারণে কোন ব্যভিচারের দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ব্যভিচার অপরাধটি সহজাতভাবে ব্যাপক ভিত্তিক ক্ষতি করে। কারণ অন্য যে কোন-ব্যক্তিও এই অপরাধের শিকার হতে পারে। ওপরের আলোচনা থেকে হদ ও কিসাসের অপরাধের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হদযোগ্য অপরাধের শিকার যদিও ব্যক্তিগতভাবে হয়ে থাকে এবং ক্ষয়ক্ষতিটাও ব্যক্তির উপরই বর্তায় কিন্তু এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা গোটা সমাজে বিস্তার লাভ করে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরিস্থিতি বিচারে সমাজ এর চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য শরীয়ত হদের শাস্তি প্রদানের অধিকার সমাজকে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সত্তাকে যুক্ত করেনি। এর বিপরীতে কিসাস সমাজের চেয়ে ব্যক্তি সত্তাকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্য ইসলামী আইন কিসাসকে সেই ব্যক্তির অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষমা, সমঝোতা, মৈত্রী ব্যক্তি অধিকারের ক্ষেত্রেই জায়েয করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য হল যে ব্যক্তি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রতিশোধ নেয়ার দ্বারা যাতে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। কোন কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করা বা ছাড় দেয়াকে ভালো মনে করে তাহলে তাকে তা করার সুযোগ দেয়া উচিত। কেননা ক্ষতিগ্রস্ত তো সেই হয়েছে। মূল কথা হলো, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ কারণে প্রতিশোধের বদলে ক্ষমা বা ছাড় দেয়াকে প্রধান্য দেয় তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বিচারক তার এই দাবীকে মেনে নেবে।

কিসাস ক্ষমা করার পরও কেন তাযিরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ক্ষমা, ছাড় কিংবা কোন সঙ্গত কারণে যদি অপরাধী কিসাস থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তবে এর অর্থ এই নয় যে সে সব ধরনের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। কেননা কিসাসযোগ্য অপরাধে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে গোটা সমাজই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সমাজের অধিকার আছে তাকে কিসাস ছাড়া অন্য কোন শাস্তি দেয়ার। তাযিরের সীমানা খুব

ব্যাপক। তাছাড়া সমকালীন শাসকের অধিকার রয়েছে যে কোন ধরনের অপরাধীকে এমন শাস্তি দেয়ার যাতে ভবিষ্যতে সে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে এবং অন্য লোকেরাও যাতে শাস্তির ভয়ে এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়। বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমা করার দ্বারা কিসাস মূলতবী হয়ে গেলেও অপরাধীকে আর কোন শাস্তি না দেয়ার ব্যাপারটিকে মজবুত করে না বরং অপরাধী ক্ষমাপ্রাপ্ত কিংবা কিসাস মওকুফ হলেও শাসক প্রয়োজন বোধে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন।

অপরাধ ও শাস্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত

পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি, ফকীহগণ হদের সংগা এভাবে দিয়েছেন, হদ এমন শাস্তির নাম হককুল্লাহ (PUBLIC RIGHT) লঙ্ঘনের অপরাধে যা ওয়াজিব হয় আর কিসাস এমন শাস্তি নাগরিক অধিকার (PRIVATE RIGHT) লঙ্ঘনের অপরাধে যা ওয়াজিব হয় এবং তাযির এমন অনির্ধারিত শাস্তি যা কখনো ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধেও ওয়াজিব হয়। এই তিন প্রকার শাস্তির মধ্যে পার্থক্যের উদ্দেশ্য হল, ইসলামী আইন দ্বারা গণমানুষকে অপরাধমুক্ত রাখা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা। তাযির ও হদের মধ্যে পার্থক্য হল, তাযিরের মধ্যে শাস্তি পূর্ব নির্ধারিত থাকে না, আর হদের শাস্তি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। সেই সাথে তাযির ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধেও হয়ে থাকে আবার হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধেও হয়ে থাকে। কিন্তু হদ শুধুই হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে হয়। তাযির ও কিসাসের মধ্যে পার্থক্য হল, তাযির অনির্দিষ্ট শাস্তি আর কিসাস নির্ধারিত শাস্তি। সেই সাথে তাযির কখনো ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের জন্য কখনো হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে প্রয়োগ হয় কিন্তু কিসাস শুধুমাত্র ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধেই ওয়াজিব হয়। কিসাস ও হদের মধ্যে পার্থক্য হল, কিসাস শুধু ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয় আর হদ শুধুই আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকেই শাস্তি পূর্ব নির্ধারিত।

কিসাসের শাস্তিকে হদও বলা যায়। কারণ অন্যান্য হদের মতো কিসাসের শাস্তিও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট। হদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে সেইসব মর্যাদাবান অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ঐগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা বা হদ ওগুলোর কাছেও যেয়ো না'। কুরআন মাজীদের অন্য জাগয়ায় মীরাসের আইন এবং বৈবাহিক আইনের ক্ষেত্রেও হদ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, 'এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত হদ বা সীমা, এই সীমা অতিক্রম করো না।' মোদ্দা কথা হলো, আল্লাহ যে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই হদ।

শুধু নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহকে হদ বলা আর কিসাসকে হদ থেকে আলাদা করা ফকীহগণের পারিভাষিক ব্যাপার; নয়তো আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে কিসাস ও হদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ উভয় শাস্তি অপরাধ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখে। ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের

অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কারণে এটিকে হদ বলা যাবে না এমন নয় এবং এর ভিন্ন নামকরণের বিষয়টিও জরুরী নয়। কেননা শাস্তিকে হদ বলে অভিহিত করা এবং সেটিকে হককুল্লাহ কিংবা হককুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে কার্যকর করার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যেসব কারণে হদকে হদ বলা হয় সেইসব উপাদান কিসাসের মধ্যেও পাওয়া যায়। এগুলো হদের মতোই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং এই শাস্তি মানুষকে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখে। আবুইয়া'লা ও আল মাওয়ারদী উভয়ের 'আহকামুস সুলতানিয়া' গ্রন্থে আমার এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁরা উভয়েই বলেছেন, 'অপরাধ হলো এমন নিষিদ্ধ জিনিস আল্লাহ তাআলা যেগুলো থেকে হদ ও তাযিরের দ্বারা মানুষকে বিরত রাখেন। ফকীহগণ হদসমূহকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হলো যা হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয় আর অন্যটি হককুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হয়। হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যা সাব্যস্ত হয় সেটিও দুই প্রকার। একটি হলো যা আল্লাহ নির্দেশিত কোন ফরয লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় আর অপরটি আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন অপরাধ কর্ম করার অপরাধে ওয়াজিব হয়। প্রথমটির উদাহরণ নামায, রোযা যাকাত আদায় না করা। যে হদ আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ করার অপরাধে ওয়াজিব হয় সেটি আবার দুই প্রকার। আল্লাহর হক হিসেবে যেসব নিষিদ্ধ কাজের ওপর হদ প্রয়োগ হয় তা চার ধরনের। যথা– ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ও ডাকাতি। যেসব নিষিদ্ধ কাজের ওপর ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে হদ ওয়াজিব হয় তা দুই ধরনের– যেমন মিথ্যা অপবাদ ও মানুষের জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ।

এই বিভাজনের দৃষ্টিতে কিসাস (দৈহিক ক্ষতির জরিমানা) হুদুদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে দেখলে শাস্তি তিন প্রকার না হয়ে দুই প্রকার হয় তথা হদ ও তাযির। বস্তুত সব অপরাধ দুই পর্যায়েই পড়ে হদযোগ্য অপরাধ ও তাযিরযোগ্য অপরাধ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আসসিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ'য় বলেছেন, তাযির যদি হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় তাহলে কেউ কেউ তাযিরকেও হদ অর্থে ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে তারা বিখ্যাত হাদীস 'দশ দুররার বেশি শাস্তি কেবল আল্লাহর নির্ধারিত হদের ক্ষেত্রেই দেয়া যেতে পারে' এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন, এখানে হুদুদুল্লাহ দ্বারা সেইসব অপরাধকে বোঝানো হয়েছে যেগুলো হককুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয়। কোন ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি লোকজন দিয়ে থাকে তা কোন অবস্থাতেই দশ দুররার বেশি হতে পারবে না। ইবনে তাইমিয়া বলেন, তাযিরী শাস্তিকেও হদ বলার একটা নতুন রীতি চালু হয়েছে।[১৫]

সারকথা : হদ শব্দের ব্যাপকতার দাবী হলো, অপরাধকে শ্রেণী বিন্যাস করার ক্ষেত্রে আমরা যেন একটি সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী নীতিমালা মেনে চলি। আমার মনে হয় আমরা কিসাস ও হদ উভয়টিকে নির্দিষ্ট (PRESCRIBED) শাস্তি বলতে পারি। যদি এগুলোর কোনটি হককুল্লাহ ও হককুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে ওয়াজিব হয় তবে এসব অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে কোন হেরফের ঘটে না। কারণ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত। এর বিপরীতে তাযীরের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ

ভিন্ন। তাযীর হক্কুল্লাহ বা হককুল ইবাদ যাই লঙ্ঘনের অপরাধে সাব্যস্ত হোক না কেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়। বস্তুত আমরা তাযীরকে অনির্দিষ্ট শাস্তি (UNPRESCRIBED PUNISHMENT) বলতে পারি। এভাবে শাস্তি হয় দুই প্রকার। একটি নির্ধারিত শাস্তি আর অপরটি অনির্ধারিত শাস্তি। শাস্তির এই বিভাজন শাস্তি নির্দিষ্টকরণ ও অনির্দিষ্টকরণের ভিত্তিতে করা হয়। এটি এমন একটি মৌলিক ভিত্তি যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, পরিষ্কার ও সর্বজন সম্মত। ফকীহগণ অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অপরাধের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন, তাতে আমাদের এই বিভাজনকে রোধ করে এমন কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। বস্তুত এই মতভিন্নতা একান্তই ভাষাগত। তাই আমাদের শ্রেণী বিন্যাস যে ফকীহদের শ্রেণী বিন্যাসের উপযোগী হতে হবে তা জরুরী নয় বরং আমাদের বিভাজন ফকীহদের বিভাজনের পরিপন্থীও হতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

১. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী পৃষ্ঠা- ২২৫-২২৬।

২. এই অধিকার যদি ব্যক্তিকেও দেয়া হয় তবুও আদালতের তত্ত্বাবধানে তা প্রয়োগ করতে হবে। আদালত যদি মনে করে ব্যক্তিকে দেয়া অধিকারের অপব্যবহার হচ্ছে, তাহলে আদালতের এই অধিকার থাকা উচিত, প্রয়োজন বোধ করলে কাযী ক্ষমা প্রত্যাহার করে শাস্তি দিতে পারেন। (অনুবাদক)

৩. মিসরে একটি আইন করা হয়েছে যে আইনের দৃষ্টিতে কিছু কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার কোন প্রতিনিধি যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশের কাছে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত মামলা চালু করা যায় না। এমন অভিযোগকেও আমলে নেয়া হয় না অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর যদি তিন মাসের মধ্যে অভিযোগ দায়ের না করে। যেসব অপরাধ এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হলো, মিথ্যা অপবাদ, গালি-গালাজ, ভিত্তিহীন বদনাম, স্বামী-স্ত্রীর কারো ব্যভিচার, কোন নারীর প্রতি অশ্লীল আচরণ (প্রকাশ্য না হলেও) কোন শিশুর লালন-পালন ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে আদালতের দেয়া ফয়সালার পরও সেই ব্যক্তির কাছে শিশুকে হস্তান্তর না করা। পিতা বা মাতার কেউ আদালত নির্ধারিত অভিভাবকের কাছ থেকে শিশুকে নিয়ে যাওয়া (যদি সেটি বল প্রয়োগ কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে নাও হয়ে থাকে) যার বিরুদ্ধে স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া, অথবা অভিভাবকত্বের অনুমোদন, অথবা শিশু লালন-পালনের ব্যয় পাওয়ার অধিকার অথবা পালনকারীর ব্যয় প্রাপ্তির, অথবা কোন ঘর ভাড়ার ডিক্রী থাকে এবং সেই ডিক্রীর কপি তার হাতে বর্তমান থাকার পরও যদি তিন মাসের মধ্যে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ না করে। আমি মনে করি উল্লেখিত অপরাধগুলোর অধিকাংশই যেগুলো ব্যক্তি অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলোর মধ্যে সামাজিক অধিকারের চেয়ে ব্যক্তি অধিকার প্রাধান্য বিস্তার করে, সম্ভবত এসব কারণেই মিসরের আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কিংবা তার কোন প্রতিনিধির লিখিত বা মৌখিক অভিযোগের উপর নির্ভরশীল করেছেন। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ফকীহগণ এটার ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, যে সব শাস্তি ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের কারণে ওয়াজিব হয় সেগুলোর কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, অর্থাৎ এর বিচারের জন্য বিচার প্রার্থীর পক্ষ থেকে দাবী করতে হবে।

৪. এ ক্ষেত্রে এ দিকটি মনে রাখতে হবে, কোন বিচারক যদি কোন ব্যাপারে ইজতিহাদ করতে অপারগ হন, তবে তিনি সেই মামলাটি আরো উচ্চতর আদালতে স্থানান্তরিত করতে পারেন। সকল ফকীহর ইজমা (Concensus) হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন পরিষদের অধিকার রয়েছে, তারা তাযিরী অপরাধের জন্য বিস্তারিত বিধান চিহ্নিত করে বিচারকদের ব্যাপক স্বাধীনতাকে আইনের মাধ্যমে সীমিত করতে পারে।

ইসলামী শাসনের শুরুর দিকে খলীফার মজলিশে শূরার এই ক্ষমতা ছিল। পরবর্তীতে এই আইন বিচারকদের কার্যবিধি প্রণয়নের (JUDG EMADE LAW) মাধ্যমে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। যার মধ্যে বিচারকদের অবশ্যই এমন মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অধিকারী হতে হতো যাদের উদ্ভাবনী বা ইজতিহাদী ক্ষমতা সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বীকৃত ছিলো। এ দিক থেকে সেইসব ব্যক্তি বর্তমান সময়ের আইন প্রণয়নকারী সদস্যদের তুলনায় বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে অনেক অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। যার ফলে তাদের ক্ষমতার ব্যবহারকে কোন অবস্থাতেই স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার বলে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই। বর্তমানে যেমন কোন আইন পরিষদ কিংবা সংসদে তৈরি আইনকে স্বৈরতান্ত্রিক আইন বলা যায় না। (অনুবাদক)

৫. সুবুলুস সালাম শরহে বুলুগুল মারাম, মাতবায়ে ইসতিকামাত, কায়রো, ছাপা ১৩৫৭ হিঃ খণ্ড-৪ পৃ: ৫৪। হাশিয়া ইবনে আবেদীন, অর্থাৎ রদ্দুল মুখতার আলা দুররিল মুহতার খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৮৩। সুবুলুস সালামের শব্দগুলো এমন- 'যাদেরকে তাযিরের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, অপরাধের ধরনও অপরাধীদের অবস্থা বিবেচনায় রেখে উপযোগী ফয়সালা দেয়ার জন্যে ইজতিহাদ করা তাদের জন্যে খুবই জরুরী।

৬. সুবুলুস সালাম শরহে বুলুগুল মারাম, হাশিয়া আবিল খালাস আলা হামশ। দুরারুল হুক্কাম খণ্ড-২ পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫, মাতবায়ে ওয়াহাবিয়া মিসর ১৯২৪। হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৩, ওয়াকিয়াতুল মুফতিয়্যিন, পৃষ্ঠা-৬০ মাতবায়ে আমীরিয়া (মিসর) ১৩০০ হিঃ। ফাতওয়ায়ে আলমগীরী খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৭। দ্বিতীয় সংস্করণ, মাতবায়ে আমীরিয়া বোলাক, মিসর ১৩১০ হিঃ।

৭. আলমগীরী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৭।

৮. ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'আকীলা' শব্দের দ্বারা ঐসব লোককে বোঝায়, যারা দিয়াত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধীর সাথে অংশগ্রহণ করে। (অনুবাদক)

৯. আলমগীরী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৭।

১০. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী পৃষ্ঠা-২২৬, হাশিয়া ইবনে আবেদীন অর্থাৎ রদ্দুল মুখতার আ'লা দুররিল মুহতার খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা- ১৯৫ এবং এরপর। শরহে তানবীরুল বাসসার যা ইবনে আবেদীনের শরহে দুররুল মুহতারের হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে ১৯৫ পৃষ্ঠা ও এরপর। আহকামুস সুলতানিয়া আবুয়া'লা পৃষ্ঠা-২৬৫। তাতে লেখা হয়েছে, 'তাযির বাস্তবায়নের সময় যদি ঘটনাক্রমে কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে জরিমানা ওয়াজিব হবে না।'

১১. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৮৩।

১২. আলফুসূলুল খামসাতা আশারা ফিত তাযির, আল আসতার ওয়াশনী পৃষ্ঠা-২।

১৩. দীনের বিরুদ্ধাচরণ তথা মুরতাদ হওয়া আর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ইসলামী আইনে একই পর্যায়ভুক্ত। ইসলামে দীন ও রাজনীতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কোন ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও আনুগত্য গ্রহণের পর যদি আনুগত্য পরিপন্থী কাজ করে অথবা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে উভয় অবস্থাতেই তাকে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। -(অনুবাদক)

১৪. শারহিল মুনতাহা, শায়খ মনসুর বিন ইউনূস আলবাহুতি আলহাম্বলী প্রণীত। এই কিতাবটি কাশফুল কিনা আল-মাতানিল আকনা'র হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে। খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৫, আসসিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃ: ৫৫-৫৬।

১৫. আসসিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ৬৮-৭৩

ইসলামে পানি আইন ও বিধিমালা

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

তিন

পাহাড়ী ঝরনা এবং বৃষ্টির পানি সম্পর্কে শরীয়ার বিধান হচ্ছে, যে বা যারা দখলমুক্ত জমিতে পানির আধার তৈরি করবে সে বা তারাই সেচের একক সত্ব ভোগ করবে।[১]

বৃষ্টির পানি যে জমিতে পতিত হয় সে জমির মালিকের উপর পানির মালিকানা বর্তায়। অবশ্য ফসল মরে যাবার আশংকা দেখা দিলে সেচের জন্য ঝরনা ও বৃষ্টির পানি দিতে অস্বীকার করা যায় না, ফসল রক্ষার জন্য পানি ভাগাভাগি করতে হবে।[২]

মালিকানার আওতা

সেচের অধিকার বা সত্ব দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। তবে কোনও দাবীদার যদি যথার্থ সাক্ষ প্রমাণ ও দলিলাদি পেশ করে প্রমাণ করতে পারেন যে সংশ্লিষ্ট জমি, স্থাপনায় তার মালিকানা রয়েছে তাহলে সেচের দীর্ঘ মেয়াদী সত্ব বাতিল করা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত দাবীদার তা প্রমাণ করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোক্ত সত্বাধিকারীর সত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে।[৩] যদি কোনও ব্যক্তি মালিকানা ব্যতিরেকে অথবা প্রকৃত মালিকের অনুমতি ছাড়া সেচের অধিকার প্রয়োগ করেন এবং তা প্রলম্বিত হয় তাহলে নিছক দখলী সত্বের কারণে মালিক তার মালিকানা হারাবেন না, কেননা আনুষ্ঠানিক দলিল সম্পাদনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র মালিকানার পরিবর্তন হতে পারে। দীর্ঘদিন যদি এই অবস্থা অব্যাহত থাকে এবং উপযুক্ত দলিল প্রমাণের অভাবে প্রকৃত মালিক ও সত্বাধিকারী নির্ণয় করা কঠিন হয় তাহলে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে।[৪] এ কারণেই সময়ের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেচের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে জবর দখলের কোনও স্থান নেই। চুক্তি অথবা সমঝোতার ভিত্তিতে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে।[৫]

শিয়া মতবাদ

১. সাধারণ নীতি : সমাজের অনুকূলে দায়িত্ব যাই থাকুক না কেন দলিল মূলে মালিকানা প্রাপ্ত ব্যক্তিই সেচ স্থাপনার অধিকার সত্ব ভোগ করবেন।

২. প্রকৃত মালিকদের মধ্যে পানি বন্টন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

লেখক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক।

ক. পাহাড়ী ঝরনা, কুয়া ও বৃষ্টির পানি ঃ পানি সবরাহ পর্যাপ্ত হলে এবং মালিকদের মধ্যে ঐকমত্য থাকলে প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী পানি বন্টনে কোনও সমস্যা নেই। পক্ষান্তরে পানির সরবরাহ যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে সেচ নালা পাশে অবস্থান নির্বিশেষে জমির পরিমাণের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে পানি প্রদান করতে হবে।[৬]

খ. খননকৃত খালের পানি ঃ এই পানি খননকারীদের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং খনন কাজে বিনিয়োগকৃত তহবিলের পরিমাণের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে সেচের অধিকার নির্ণিত হয়।[৭]

গ. প্রাকৃতিক খাল বিল ও স্রোতধারার পানি ঃ উজানের ভূমি মালিকরাই প্রাথমিকভাবে এই পানি ব্যবহারের অধিকার ভোগ করেন এবং প্রক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

(১) ফসলের জন্য ঃ চারার গোড়া পানিতে ডুবতে হবে।

(২) গাছপালার জন্য ঃ গাছের শিকড় পরিমাণ পানি দিতে হবে।

(৩) খেজুর গাছের জন্য ঃ গাছের কাণ্ড পর্যন্ত পানি দিতে হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে পানি দেয়ার পর যদি উদ্বৃত্ত পানি থাকে তাহলে উজানের মালিক ভাটির জমিতে সেচের জন্য পানি ছাড়তে পারেন। তার প্রয়োজন পূরণের আগে এমনকি ভাটির জমির ফসল খরায় নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি ছাড়তে বাধ্য নন।[৮]

মুতাজিলা মতবাদ

১. বৃষ্টির পানি ঃ এ ক্ষেত্রে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের ইবাদতপন্থীরা সুন্নী নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেন। জমির সাইজের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বৃষ্টির পানি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা হয়। যদিও উজানের প্লট মালিকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানির দাবিদার, তবুও যদি ভাটির কৃষকরা তাদের আগে ফসল লাগিয়ে থাকেন তাহলে এই অগ্রাধিকার স্থানান্তরযোগ্য।[৯]

২. নদী ও স্রোতধারা ঃ এখানেও সুন্নীদের অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, তবে তাদের পানি বন্টন পদ্ধতি স্বতন্ত্র। জমির অবস্থান উজান ভাটি যেখানেই হোক না কেন জলাধার সন্নিহিত এলাকার জমিতে পানি সেচের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক ফসলের প্রয়োজনে এক বা একাধিক স্থানে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে রেখে তা ব্যবহার করতে পারেন। আবাদী জমির আকার ও মূল্য অনুযায়ী এই পানি মোট প্রবাহের এক দশমাংশ এক অষ্টমাংশ এবং সর্বোচ্চ এক পঞ্চমাংশ হতে পারে।[১০] প্রথমোক্ত ব্যবহারকারীর পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাটির প্রথম কৃষক তার জমিতে সেচের জন্য সর্বোচ্চ এক পঞ্চমাংশ পানি প্রত্যাহার করতে পারেন। পরবর্তী কৃষকদের বেলায়ও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য।[১১]

মুতাজিলা বিধি অনুযায়ী পানির অধিকার হস্তান্তর ছাড়াও জমির মালিকানা হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে শর্ত এই যে শরীকরা যৌথভাবে জমিতে সেচের কাজে পানি ব্যবহার করবেন এই মর্মে সুনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অনুরূপভাবে পানি ভাগাভাগির চুক্তির ভিত্তিতে জমি হস্তান্তর ছাড়াই পানির অধিকার হস্তান্তর করা যেতে পারে।[১২]

৩. সেচের পানির ওপর তৃতীয় পক্ষের অধিকার ঃ সেচ কাঠামোর ক্ষতি হবে না এই শর্তে যে কোন লোক অন্যের সেচ নেটওয়ার্ক অতিক্রম করতে পারবেন। তবে তিনি জমিতে পানি জমানোর জন্য গর্ত খনন করতে পারবেন না, অথবা পাথর, মাটি বা অন্য কোনও উপায়ে বাঁধ নির্মাণও তার জন্য নিষিদ্ধ। অবশ্য কোন কোন আইন বিশেষজ্ঞ তিন আঙ্গুল পরিমাণ অথবা লাঙ্গলের ফলার গভীরতার সমান মাটি কেটে জমি নীচু করার অধিকারের কথা স্বীকার করেছেন।[১৩]

মাছ ধরার অধিকার

এ ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী সকল প্রকার জলাশয়ে বিনা বাধায় মাছ ধরার অধিকার সকল নাগরিক সংরক্ষণ করেন। মালিকানা নির্বিশেষে যে কোন জলাশয়ে যে কোনও ব্যক্তি মাছ ধরতে পারেন। তবে এই মাছ প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা মাছ হতে হবে; কেউ যদি মূলধন বিনিয়োগ করে, বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করেন তাহলে অন্যদের উপর এই সাধারণ অধিকার প্রযোজ্য হবে না।[১৪] এখানে উল্লেখ্য যে মুসলিম আইন অনুযায়ী পানিতে মাছ রেখে সেই মাছ বিক্রি করা অবৈধ। কেননা এ পরিস্থিতিতে বিক্রিযোগ্য পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা বিক্রেতা কারোর কাছেই পর্যাপ্ত তথ্য থাকে না। মুসলিম আইন অনুযায়ী অজ্ঞাত বস্তুর ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত যে কোনও চুক্তি অবৈধ।[১৫]

পানির মলিকানা হস্তান্তর

ইসলামী আইন অনুযায়ী শিয়া সুন্নী নির্বিশেষে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে পানি বিক্রিযোগ্য। তবে বিক্রি প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। নিম্নে এর বিবরণ দেয়া হলো ঃ

সুন্নী মতবাদ

১. পানি বিক্রি ঃ হানাফী ও হাম্বলী মযহাব অনুযায়ী শুধুমাত্র কনটেইনার বা আধারে রক্ষিত পানিই বিক্রিযোগ্য, নদীনালা, খাল বিল বা অন্য কোন জলাশয়ে রক্ষিত পানি বিক্রিযোগ্য নয়।[১৬]
মালেকী মযহাব অনুযায়ী গবাদি পশুর জন্য খননকৃত কুয়া বা জলাশয়ের পানি ছাড়া আর যে কোন স্থাপনার মালিক তার নিজের ইচ্ছামত পানি বিক্রি অথবা বিতরণ করতে পারে। তবে বিক্রির উদ্দেশ্য অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে। সামষ্টিক স্বার্থকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে পানি বিক্রি করা যাবে না।[১৭]
২. সেচ সত্ব বিক্রয় ঃ সেচের অধিকার জমির সাথে সম্পৃক্ত এবং এ প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই জমির লেনদেন বা ক্রয় বিক্রয়ে এই অধিকারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। মালিক সেচ সত্ব ছাড়াই তার জমি বিক্রি বা বিলি বন্টন করতে পারেন তবে জমির মালিকানা হস্তান্তর হবে কিনা তা নিয়ে আইনজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।
হানাফি মযহাব অনুযায়ী সেচ সত্ব বিক্রিযোগ্য নয়, শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রেই এর মালিকানা পরিবর্তন হতে পারে। জমির মালিক ইচ্ছা করলে সন্নিহিত অন্য জমিতে সেচের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, এতে ঐ জমির মাল ও মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।[১৮]

পক্ষান্তরে মালেকী মযহাবে সেচ সত্ব বিলি বন্টনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজে পানি ব্যবহারের অধিকার সংরক্ষিত রেখে তারা এই সত্ব বিক্রির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই মযহাব অনুযায়ী সেচের পালাও (Irrigation Turn) বিক্রি করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে স্থাপনার উপর অধিকার, তার বিক্রয়, ব্যবহার ও ভাড়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই অক্ষুণ্ন থাকবে।[১৯]

শিয়া মতবাদ

এই মতবাদের অনুসারীদের মতে পানি ওজন অথবা পরিমাপের ভিত্তিতে বিক্রি করা যেতে পারে; থোক পরিমাণের ভিত্তিতে তা বিক্রিযোগ্য নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে অপরদ্রব্যের সম্ভাব্য মিশ্রণের কারণে পানি ডেলিভারী দেয়া অসম্ভব হয়ে যেতে পারে।[২০]

মুতাজিলা মতবাদ

এই মতবাদের অনুসারীরা এক্ষেত্রে সুন্নী আইন অনুসরণ করে থাকেন।

১. পানি বিক্রি ঃ কলসী, চামড়ার পাত্র অথবা যে কোন আধারে পানি বিনা মূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে দান, বিক্রয় অথবা বিতরণ করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে পানির মালিকানাও হস্তান্তরযোগ্য। নদীর খাদ ও চৌবাচ্চার পানির বেলায়ও একই বিধান প্রযোজ্য।

২. সেচ সত্ব বিক্রয় ঃ মালেকী মযহাবের আইন অনুযায়ী এই বিষয়টির সুরাহা করা হয়।

সেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

সুন্নী মতবাদ

১. সাধারণ নীতিমালা ঃ সুন্নী আইন অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত কোনও সেচ স্থাপনার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারেন না। বৈধ মালিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করার শর্তে পানি বরাদ্দ ও বিতরণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে ঃ

ক. কোনও ব্যক্তি তার জমি বা সম্পত্তির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার কারণে সমস্ত পানির ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না।

খ. যদি কারোর সম্পত্তির উপর দিয়ে পানির প্রবাহ অতিক্রম করে তবে পানিকে তার স্বাভাবিক গতিপথে ফেরত দেয়ার শর্তে এর অংশ বিশেষ সেচ, গৃহস্থালী অথবা শিল্প কাজে ব্যবহার করা যাবে।

গ. উজানভাটি নির্বিশেষে নদী বা খালের তীরবর্তী সকল বাসিন্দা পানি ব্যবহারের অধিকার ভোগ করেন। তাদের এই অধিকারকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

ঘ. তীরের বাসিন্দারা সেচ কাজে পানি ব্যবহারের অধিকার প্রয়োগের প্রাক্কালে কোনক্রমেই এ সংক্রান্ত সাধারণ নীতিমালা লঙ্ঘন কিংবা প্রবাহে পরিবর্তন আনতে পারেন না।

২. অধিক্ষেত্র ঃ ভাটির জমি উজান থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত পানি প্রবাহ ব্যবহার করতে পারবে। ভাটির কোনও কৃষক তার জমিতে বাঁধ দিয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে

না। অনুরূপভাবে উজানের কৃষকরাও তাদের জমিতে বাঁধ দিয়ে অথবা অন্য কোনওভাবে পানির গতিরোধ কিংবা তা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।[২১]

উপরোক্ত বিধি নিষেধকে সামনে রেখে জমির মালিক তার জমিতে অবস্থিত ঝরনার পানি ব্যবহার করতে পারবেন, তবে তা ধ্বংস করতে পারবেন না।[২২] অন্যের সেচাধিকার হরণকারী ব্যক্তি নিসন্দেহে একজন অপরাধী এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দিতে হবে।[২৩]

শিয়া মতবাদ

এই মতবাদ অনুযায়ী যদি কোনও ব্যক্তি নদী নালা বা জলাধারের তীরবর্তী এলাকার কোনও খালি জমি চাষাবাদযোগ্য করে ব্যবহার করতে চান তাহলে পুরাতন ভূমি মালিকদের সেচ চাহিদা পূরণের পর পানি উদ্বৃত্ত থাকলে সে পানি তিনি জমিতে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এই নীতির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।[২৪]

মুতাজিলা মতবাদ

তীরবর্তী এলাকার যে কোন বাসিন্দা তার জমির ক্ষতি করতে পারে এ ধরনের যে কোন তৎপরতা বা কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে পারেন। এই মতবাদের অনুসারী আইনজ্ঞদের মতে ভাটির জমিতে পানি সরবরাহে কোনও বাধা নেই।

ভাটি এলাকার জমিতে অতিরিক্ত পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা না থাকলে তীরবর্তী অঞ্চলের সকল কৃষকের সম্মতি ছাড়া এ জমির উপর দিয়ে উজানের কৃষকদের চলাচলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না।[২৫]

পানির সত্বাধিকারীর পূর্বানুমতি না নিয়ে অথবা কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি পানি ব্যবহার করেন তাহলে সত্বাধিকারী তার সত্ব পুনরুদ্ধার করতে পারেন। এতে যদি রোপনকৃত গাছ মরেও যায়। অধিকার ছাড়া যদি কেউ সেচ সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেচ স্থাপনের মালিককে তার ফসল ছেড়ে দিতে হবে।[২৬]

হারেম বা নিষিদ্ধ এলাকা

১. **সাধারণ নীতিমালা ঃ** নতুন কুয়া খনন করে যাতে পানির স্তর ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সকল মতবাদের অনুসারী মুফতি ও আলেমদের ঐকমত্য হচ্ছে এই যে কোনও খাল বা কুয়ার মালিকানার সাথে সন্নিহিত এলাকার কিছু জমির মালিকানাও যুক্ত থাকবে। এটাই হচ্ছে হারেম বা নিষিদ্ধ এলাকা অর্থাৎ এই এলাকায় অন্য কোন কুয়া বা খাল খনন করা যাবে না।

হারেমের আকার

১. হানাফী ও হাম্বলী মতাদর্শ অনুযায়ী কুয়া যদি উটের গোসলের জন্য খনন করা হয়ে থাকে তাহলে হারেমের এলাকা হবে ৪০ হাত, সেচের জন্য হলে ৬০ হাত। ঝরনা বা অন্য জলাধারের বেলায় এই এলাকার পরিমাণ ৩০০ থেকে ৫০০ হাত পর্যন্ত বিস্তৃত।[২৭]

২. মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে হারেমের এলাকা এক রকম (uniform) হতে পারে না; স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করতে হবে।[২৮]

তথ্যপঞ্জি

১. খলিল ইবনে ইসহাক, code Musulman par Khalil, Rite Malekili, section 2 & 22.
২. খলিল ইবনে ইসহাক প্রাগুক্ত।
৩. Ali Ibn Muhammad ---- Public Law in Islam. Page 172.
৪. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৭২।
৫. মিশকাত আল মাসাবী, পৃষ্ঠা ২৮২।
৬. Querry, A. Property Law in Muslim society, Article 69-73.
৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড ধারা ৭৫।
৮. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড ধারা ৭৬ ও ৭৭।
৯. Feliu. E. Elude Sur La Legislation Des Eaux Dense La Chebka Du Mzhab, Article-6.
১০. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৭।
১১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৮।
১২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২২।
১৩. প্রাগুক্ত অনুচ্ছেদ ১৬৬, ১৬৭।
১৪. Khalil Ibn Ishaq, Code Musalman par Khalil, Rite Malekili, section 22 & 23.
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম, আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ পৃ. ৫৪।
১৭. খলিল ইবনে ইসহাক, প্রাগুক্ত, সেকশান ১৬ ও ১৭, অনুচ্ছেদ ১২২০।
১৮. ইবনে আবেদীন, দুররুল মোখতার, ৫য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১।
১৯. মালিক বিন আনাস, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১২১-১২২।
২০. কোয়েরী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, অনুচ্ছেদ ৬৭।
২১. মোহাম্মদ ইবনে আলী, আল সানুসী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
২৩. ইবনে আবেদীন, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১।
২৪. কোয়েরী, এ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, অনুচ্ছেদ ৭৮।
২৫. Feliu. E. Mzab Base Legislation in Islam, Article-89.
২৬. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১৬২ ও ১৬৩।
২৭. Ahmed Ibn Muhammad, al Kuduri, Instituts du Droit Mahometan, Page 71-72.
২৮. Khalil Ibn Ishaq, al Jumdi, Code Musulman par Khalil, Rite Malekiti, Page 387, 388.

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ৭৪-৮৫

আধুনিক ব্যাংকিং ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা

মুখলেসুর রহমান হাবীব

অর্থনীতির পরিভাষায় ব্যাংক হলো মধ্যসত্বভোগী এমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যা বিক্ষিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পুঁজি প্রত্যাশী ব্যক্তিদেরকে উচ্চ সুদ বা লাভের শর্তে ঋণ বাবদ প্রদান করে এবং অর্থ সংরক্ষণ ও তার প্রচলন করে এবং বিলবাট্টা ও মূল্য স্থানান্তর সহ অর্থ সংক্রান্ত বহুমূখী ব্যবসায়ে নিরত থাকে।

মানুষের বিক্ষিপ্ত পুঁজিকে একত্রিত করে বৃহৎমানের কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংক যে কাজ আনজাম দিচ্ছে, সে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু এক কালের জনকল্যাণের সূতিকাগার ব্যাংক ব্যবস্থাই আজ শোষণের এক অভিনব হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক আদলে গড়ে ওঠা এসব ব্যাংকের মারফতে অসংখ্য হাতের বিক্ষিপ্ত পুঁজি এককেন্দ্রীক হয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ পুঁজি ব্যবহার করে দেশবাসীর অবশিষ্ট সম্পদ নিশেষে লুটে নেয়ার হীন প্রয়াসে লিপ্ত হয়।

এ যুগের সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রধান চালিকাশক্তি হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ব্যাংক আমানতদার থেকে প্রাপ্ত এবং নিজেদের লগ্নিকৃত পুঁজি যে ভাবেই বিনিয়োগ করে, তা সবই সুদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। বস্তুত এ সুদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় জনসাধারণ থেকেই উসূল করা হয় এবং তাদের শ্রমার্জিত অর্থ সুদ বাবদ শোষিত হয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির নিকট পুঞ্জিভূত হয়। ঋণ গ্রহীতা থেকে ব্যাংক উচ্চহারে সুদ আদায় করে এবং আমানত প্রদানকারীদেরকে অপেক্ষাকৃত কম হারে সুদ প্রদান করে। এতে যে মধ্যসত্বলাভ হয় তাই ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। ব্যাংক ও ব্যাংক থেকে লব্ধ সুদ বিষয়ক কতিপয় আধুনিক মাসআলা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ব্যাংকের সুদের টাকায় ট্যাক্স আদায়

সাধারণ জনগণ থেকে সরকার যে ট্যাক্স উসূল করে তা সাধারণত দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ট্যাক্স হলো, যা জনগণের উপর ন্যায্যভাবে আরোপিত হয়ে থাকে। যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস লাইন স্থাপন, রাস্তা সংস্কার, হাসপাতাল নির্মাণ ও লাইব্রেরী স্থাপন ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার পক্ষ থেকে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ন্যায় সংগত ভাবে আরোপিত ট্যাক্স। যার সুফল জনগণও পেয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার কর বা ট্যাক্স হলো, যা সরকার অন্যায়ভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।

লেখক : মাদরাসার শিক্ষক, গবেষক, প্রবন্ধকার।

এখানে উল্লিখিত দুই প্রকার কর বা ট্যাক্সের প্রথমটি ব্যাংকের সুদী অর্থের মাধ্যমে আদায় করা বৈধ নয়। কেননা এ জাতীয় বৈধ করের টাকা সুদের অর্থ থেকে আদায়ের পরিণাম হলো নিজের ব্যক্তিগত কাজেই সুদের অর্থ ব্যবহার করা। কারণ সে ব্যক্তি নিজেও এ সব করের বিনিময় স্বরূপ দেশের অনেক সুবিধা ও সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। তবে অন্যায়ভাবে সরকার প্রজাদের কাছ থেকে যে ট্যাক্স উসূল করে তা সুদের টাকা দিয়ে আদায় করা যায়।[১]

বিশ্বব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদী অর্থের ব্যবহার

বিশ্ব ব্যাংকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়ন ব্যাংক সমূহের জমাকৃত টাকার যে সুদ পাওয়া যায় তা ব্যবহারের খাত শরীয়তের দৃষ্টিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো-

জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের সঠিক ও গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, 'সুদ হারাম, যদিও তা অর্জিত হয় কোন অমুসলিম থেকে।' অধুনা বিশ্ব ব্যাংক অমুসলিম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাই এই ব্যাংক থেকে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো 'ইন্টারেস্ট' নামে যে মুনাফা লাভ করে, তা সুদ বৈ কিছু নয়। এ জন্যই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যে, প্রথমে ব্যাংক দ্রুত চেষ্টা চালাবে সুদী ব্যাংকের লেনদেন থেকে বেরিয়ে আসার এবং বিকল্প পথ বের করবে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা প্রচলন করার। তবে যতদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা সু-সম্পন্ন না হবে ততদিন পর্যন্ত এ জাতীয় ব্যাংক থেকে সুদের যে অর্থ পাওয়া যাবে তা একটি স্বতন্ত্র একাউন্টে জমা রাখবে। এরপর এই অর্থ আর্তপীড়িত ও অসহায়দের সেবা এবং জনকল্যাণমূলক যে কোন কাজে (সওয়াবের কোন নিয়ত না করে) ব্যয় করবে।

বিগত ১৩৯৯ হিজরীর ১০ রবিউল আউয়াল তারিখে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সমূহের জিদ্দাস্থ তত্ত্বাবধানকারী বোর্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার লক্ষ্য ছিল বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সুদ কোন খাতে ব্যয় হবে তা নিরূপন করা। অতঃপর সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের শতকরা ৫০ ভাগ 'স্পেশাল বা রিজার্ভ ফান্ড' হিসেবে রাখা হবে। সেই স্পেশাল ফান্ডের উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ব বাজারের চড়াই উৎরাইয়ের প্রভাবে ইসলামী ব্যাংক সমূহের গচ্ছিত আমানতের মূল পুঁজিতে যে ক্ষতি ও লোকসান হয়, এই স্পেশাল ফান্ডের সাহায্যে তা কাটিয়ে উঠা। এখন বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের দৃষ্টিভঙ্গি কী তা নিয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাবো। আমরা আগেই বলে এসেছি, সুদের অর্থ দ্বারা কোনক্রমেই মুসলমানের ব্যক্তিগত কাজে উপকৃত হওয়া যায় না। আর একথা সত্য যে, বাজারের চড়াই-উৎরাইয়ের কারণে ব্যাংকের পুঁজিঘাটতির যে সমস্যা দেখা দেয়, তা ব্যাংকের মৌলিক ও বুনিয়াদী সমস্যাবলীর অন্যতম। সুতরাং সেই ঘাটতির সমস্যা উত্তরণের জন্য বিশ্বব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের ৫০% ভাগ অর্থ দ্বারা স্পেশাল ফান্ড গঠন করা এবং তা সেই খাতে ব্যয় করা প্রকারান্তরে নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করার নামান্তর। অতএব এরূপ খাতে সুদের অর্থ ব্যয় করা অবৈধ।[২]

ঋণগ্রহীতা থেকে সারচার্জ হিসেবে

আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো জনস্বার্থে জনগণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ৫/১০ বৎসরের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু সুদ হওয়ার কারণে অতিরিক্ত কোন অর্থ ঋণগ্রহীতা থেকে নিতে পারে না, সেহেতু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণের কার্যক্রম সম্পাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় ভার বহন করার জন্য ঋণ গ্রহীতা থেকে সারচার্জের নামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে থাকে। যা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য কাজে ব্যয়িত হয়। এ সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত যা বলে তা অনেকটা এরূপ। ব্যাংকের ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও তার হিসাব সংরক্ষণ সহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা ঋণগ্রহীতা থেকে পরিমাণ অনুযায়ী শতকরা হারে বা ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ গ্রহণ করা যাবে। উসূলকৃত এ সারচার্জ সুদ হিসাবে গণ্য হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত রয়েছে; যা শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত। এক, সারচার্জ হিসেবে উসূলকৃত অর্থ বাজার মূল্যের অধিক হতে পারবে না। এর অর্থ হলো ব্যাংকের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ব্যয়ভার, যার বিনিময় স্বরূপ সারচার্জ গ্রহণ করা হচ্ছে, তা অন্য কোথাও করালে এ সময়ে যে অর্থ ব্যয় হতো সারচার্জ তার চেয়ে অধিক হতে পারবে না।

দুই, সারচার্জকে বাহ্যিক খোলস হিসেবে ব্যবহার করে একে মোটা অংকের মুনাফা হাতিয়ে নেয়ার অভিনব পন্থারূপে গ্রহণ করা যাবে না। যদি এ শর্তদ্বয়ের কোন একটি না থাকে; বরং সুদী ব্যাংকের মতো এ ক্ষেত্রে সারচার্জের নামে অধিক মুনাফা গ্রহণ করা হয় এবং অশুভ পুঁজিবাদী স্বার্থ চরিতার্থ হয় তা হলে তা নিঃসন্দেহে সুদী কারবারে পরিণত হবে।

সারচার্জের নামে সুদ উসূল করার মানসিকতা যাতে সক্রিয় হতে না পারে সেজন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যে, প্রথম এক বছর ঋণ জারি করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পূর্ণ ব্যয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত হিসেব বের করে তা পরবর্তী বছর জারিকৃত সমুদয় ঋণের মাঝে শতকরা হারে বন্টন করে দিবে। (ব্যাংকের প্রশাসনিক ব্যয় ভারের পরিধি বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত ব্যয় তার সাথে যোগ করে নিতে পারবে।) এভাবে শতকরা হারে জারিকৃত ঋণের উপর সারচার্জ আরোপের হিসাব নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর তখন তা ঋণগ্রহীতা থেকে শতকরা হারে সারচার্জরূপে আদায় করে নেয়া বৈধ হয়ে যাবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার ব্যয় হিসাব স্বতন্ত্রভাবে করার কোন প্রয়োজন হবে না। উপরন্তু সহজেই সারচার্জ আরোপ পদ্ধতির হিসাব বের করা সম্ভব হবে।[৩]

সুদী ব্যাংকের জন্য বাড়ীঘর ভাড়া দেয়া

জেনেশুনে সুদী ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নিজের বাড়ী-ঘর ভাড়া দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কেননা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে কোন হারাম কাজে সহযোগিতা করাকে আল কুরআন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, 'তোমরা গোনাহ ও অন্যায় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।'[৪]

অবশ্য কেউ কোন কিছু না বলেই যদি মালিক থেকে বাড়ী ভাড়া নেয় এবং সেখানে সুদী ব্যাংক বা অন্যকোন সুদী কারবার চালু করে তাহলে এতে বাড়ী মালিকের গোনাহ হবে না।[৫]

সূদী ব্যাংকে বা অন্য কোন সূদী কারবারে চাকুরী করা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূদ গ্রহণকারী, সূদ প্রদানকারী, তার লেখক এবং সাক্ষীদেরকে অভিশম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এরা সকলেই (গোনাহের ক্ষেত্রে) সমান অপরাধী। বর্ণিত হাদীসের আলোকে যারা সূদী ব্যাংকে দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থেকে অথবা অন্য কোন সূদী লেনদেনের চাকুরিতে জড়িত থেকে তা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত তারা সরাসরি লা'নতের শিকার। কেননা চাকুরীতে তাদের পজিশন হলো সূদের লেখক এবং সাক্ষীতুল্য। সুতরাং বুঝা গেল, সূদী ব্যাংক বা অন্যকোন সূদী কারবারে চাকুরী করা হারাম। আর যারা ব্যাংকে চাকুরী করে কিন্তু সূদ সংশ্লিষ্ট কোন কাজে দায়িত্ব পালন করে না বরং জায়েয কোন দায়িত্বে কাজ করে (যেমনঃ- গেটের প্রহরা, ঝাড়ু দেয়া, রিসিপশন ইত্যাদি) তারা সরাসরি সূদী কারবারে লিপ্ত না হলেও যারা লিপ্ত তাদের সহযোগিতা করছে আর কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে আগেই বলা হয়েছে যে, হারাম কাজে সহযোগিতা করাও হারাম। অতএব, এদের চাকুরীও হারাম। তবে এমন ব্যক্তি, যে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, অন্যকোন বৈধ চাকুরী বা জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা তার নেই তাই অনন্যোপায় হয়ে এই চাকুরীতে সাময়িকভাবে বহাল থাকতে শরীয়ত তাকে অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু শর্ত হলো অন্য কোন হালাল কর্মসংস্থান অহর্নিশ খুঁজে বেড়াবে সে। হালাল কর্মসংস্থান পাওয়া মাত্রই এই সূদের চাকুরী থেকে ইস্তেফা দিবে।[৬]

সূদী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা

অধুনা বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় ক্রয় বিক্রয়ের প্রচলন শুরু হয়েছে। ব্যাংক ক্রয়কৃত সে পণ্য বন্ধক রেখে সূদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে থাকে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই ক্রয় পদ্ধতিটি সূদী কারবার হওয়ায় না জায়েয। এক্ষেত্রে বৈধ পন্থা হলো ব্যাংক মূল বিক্রেতা হয়ে প্রথমে নিজে পণ্যটি ক্রয় করে ফেলবে। অতঃপর প্রয়োজনীয় মুনাফা যোগ করে তার গ্রহীতার কাছে পণ্যটি বিক্রয় করে দেবে।[৭]

সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখা

যেহেতু ইসলামী শরীয়তে কোন হারাম কাজে সহযোগিতা করাকে না জায়েয বলা হয়েছে তাই সূদী ব্যাংকে টাকা রাখার অর্থ হলো সূদী কারবারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পুঁজি দিয়ে সাহায্য করা যা সম্পূর্ণ হারাম। তবে একান্ত টাকা সংরক্ষণ করতে যারা বাধ্য হয়ে ব্যাংকের দ্বারস্থ হয় তাদের জন্য করণীয় হলো সূদমুক্ত কোন ইসলামী ব্যাংক খুঁজে সেখানে টাকা আমানত রাখা। যদি সূদমুক্ত ব্যাংক দেশে না থাকে তাহলে ব্যাংককে সূদী কারবারে সহযোগিতা করার ইচ্ছা পরিহার করে এবং নিছক অর্থ সংরক্ষণের সদিচ্ছা নিয়ে সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারে। তবে অপেক্ষায় থাকবে- কোথাও কোন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সেখানে টাকা জমা রাখা ও ওঠানোতে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সূদী ব্যাংকে জমা কৃত টাকা উঠিয়ে সূদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকে জমা রাখবে।[৮]

সুদের টাকা ব্যয় করার খাত

সুদের টাকা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা অবৈধ। অনুরূপভাবে সওয়াবের নিয়তে এই টাকা দান-সদকা করাও জায়েয নয়। অগত্যা সুদের টাকা হাতে এসে গেলে তা দুস্থ, অসহায়দের (সওয়াবের নিয়ত ছাড়া) দান করবে অথবা অন্যকোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেবে।[৯]

কট্‌কবালা বা বন্ধকি

আমাদের গ্রামীণ সমাজে প্রচলন আছে যে, গরীব লোকেরা পুঁজিপতিদের নিকট জমি বন্ধক রেখে তাদের থেকে ঋণ গ্রহণ করে। পরিভাষায় একে কটকবালা বা জমি বন্ধক রাখা বলে।

উল্লেখ্য যে, এভাবে জমি বন্ধক রাখার পর ঋণদাতা জমির কৃত্রিম মালিক হয়ে যায় এবং সেখানে চাষাবাদ করে এবং এর ফসল ভোগ করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যখন তার ঋণ পরিশোধ করে তখন পূর্ণ টাকাই তাকে পরিশোধ করতে হয়। দীর্ঘদিন জমি ভোগ করা সত্ত্বেও ঋণের কোন অংশ কর্তন করা হয়না। বস্তুত এভাবে লেনদেন করাও সুদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঋণ দিয়ে এর বিনিময়ে মুনাফা হাসিল করা এবং বন্ধক রাখা বস্তু- যা ভোগ করার অধিকার ঋণদাতার নেই- তা ভোগ করা, সুদ খাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এ জাতীয় কটকবালা বা বন্ধকী লেনদেন শরীয়তে হারাম। তবে ঋণদাতা জমির ফসল ভোগ করার বিনিময় স্বরূপ ঋণগ্রহীতার সম্মতিতে ঋণের কিছু অংশ হ্রাস করে দিলে এই বন্ধকী লেনদেন বৈধ হবে।[১০]

শেয়ার বাজার (STOCK EXCHANGE)

আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় অনেক মানুষ যৌথভাবে কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাকে কোম্পানি বলে।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর মূলত সতের শ' শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড় বড় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বৃহদংকের অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা একজন বা কয়েকজনের পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব ছিল না। তখন সাধারণ জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়কে একত্রিত করে সামগ্রিক উপকার ভোগ করার জন্য কোম্পানি নীতির আবির্ভাব হয়।

এই ধরনের কোম্পানি সরকারী অনুমোদন লাভ করার পর ব্যক্তিসত্তার ন্যায় আইনগতভাবে স্বতন্ত্র একটি সত্তারূপে বিবেচিত হয়। অতঃপর কোম্পানি তার শেয়ার (Share) ছাড়ার আগে তার প্রসপেক্টাস (Prospectus) বা কার্য বিবরণী প্রকাশ ও প্রচার করে। যাতে সাধারণ মানুষ কোম্পানি ও তার কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়। কোম্পানির মূল পুঁজির একাংশ স্বয়ং উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করে থাকে। অতঃপর মূলধনের বাকী অংশ সংগ্রহের জন্য তারা শেয়ার ইস্যু করে। উদ্দোক্তাদের দেয়া মূলধন এবং কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে ব্যাপক পুঁজি সংগ্রহ করা হয়। মূলত শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে কোম্পানির অংশীদার আর শেয়ার সার্টিফিকেট প্রকৃত পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উক্ত কোম্পানিতে আনুপাতিক হারে অংশিদারিত্বের নিশ্চয়তা।

সুদের ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহকারী কোম্পানির শেয়ার ক্রয়

সম্প্রতি বাংলাদেশ সহ বিশ্বময় কোম্পানির শেয়ার বিজনেসের ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচলন শুরু হয়েছে। অতিসম্প্রতি উন্নত বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্ব এমন কি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও কোম্পানির শেয়ার মার্কেট এর অবস্থা আশাতীত উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এই স্টক মার্কেটের কোম্পানিগুলো ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহ করে থাকে। এমতাবস্থায় সুদের ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহকারী কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয় জায়েয হবে কিনা? এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

আমাদের জানা মতে অধিকাংশ কোম্পানি দুই ভাবে সুদের সাথে জড়িত হয়। এক, কোম্পানির নিজস্ব পুঁজি বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে।

দুই, কোম্পানির অর্থ কোন ব্যাংকে জমা রেখে কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে সুদ গ্রহণ করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর একটি হল সুদ দেয়া, আরেকটি হল সুদ নেয়া।

সুদ দিয়ে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টি দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

এক, সুদের ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত।

দুই, কিংবা দায়ে ঠেকে পরে এই প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়েছে।

যদি সুদের ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত হয় এবং কোম্পানির প্রসপেক্টাসে বা মেমোরেন্ডামে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে (যেমন বর্তমানে অধিকাংশ কোম্পানির প্রসপেক্টাসে তা উল্লেখ থাকে) তাহলে সেই কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে যদিও কোম্পানি সুদদাতা হিসেবে তার সম্পদে সুদের মিশ্রণ ঘটছে না এবং সুদের ভিত্তিতে কৃত ঋণের টাকার সাথে শেয়ারারদের টাকা মিলিয়ে ব্যবসা করার দ্বারা যে মুনাফা হবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু একান্ত বাধ্য-বাধকতার মুখোমুখি না হলে সুদের ভিত্তিতে ঋণ করা নিঃসন্দেহে হারাম কাজ যা কোম্পানি নির্দ্বিধায় করছে এবং ঘোষণা দিয়েই সেই অবৈধ লেনদেনে জড়িত হচ্ছে। সুতরাং এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার খরিদ করার অর্থ হলো জেনেশুনে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে একটি অবৈধ কাজে কোম্পানিকে অনুমতি দেয়া এবং নিজে তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া। কারণ শেয়ার হোল্ডার ক্রয়কৃত শেয়ার অনুপাতে কোম্পানির অংশিদার হয়ে যায় এবং কোম্পানি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষ থেকে উকিল ও এজেন্ট হয়ে থাকে আর উকিলের সকল কর্ম-কান্ড উকিল নিয়োগকারীর কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। অতএব এ কথা বলা যায় যে, শেয়ার হোল্ডার কোম্পানিকে এজেন্ট বা উকিল নিয়োগ করছে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে কোম্পানিকে সম্প্রসারণ করার জন্য।

সুতরাং এ ধরনের কোম্পানির শেয়ারার হওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা জীবিকা উপার্জনের জন্য অনেক বৈধ পন্থা রয়েছে, হারাম কাজ পরিহার করে সেগুলোর কোনটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

আর যদি সুদের ভিত্তিতে ঋণ করে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত না হয় এবং প্রসপেক্টাসে এ ধরনের কোন কথা উল্লেখ না থাকে; কিন্তু পরে কোম্পানির পুঁজির সংকট দেখা দেয় এবং সে সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য কোন বৈধ পথ না থাকে অথচ পুঁজির যথাযথ যোগান দিতে না পারলে কোম্পানির মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। এহেন সংকট নিরসনে কোম্পানি সুদ দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে তাহলে অনন্যোপায় হওয়ার দরুন তা আইনের দৃষ্টিতে বৈধ হবে এবং উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। তবে তাকওয়ার দাবী হলো, যে কোন উপায়ে কোম্পানিকে এমর্মে অবহিত করা যে, এ সুদের দায়-দায়িত্ব আমি বহন করব না। তা চিঠি পত্রের মাধ্যমে হোক বা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের বাৎসরিক সাধারণ সভায় (A.G.M) এ একথা ঘোষণা করে দেয়ার মাধ্যমে হোক। কোম্পানির সুদী লেনদেনের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো কোম্পানির টাকা কোন প্রতিষ্ঠানে জমা রেখে কিংবা ব্যাংকে বিনিয়োগ করে তাদের থেকে সুদ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করার অর্থ হলো মুয়াক্কেল হিসেবে শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষ থেকে কোম্পানিকে এ ধরনের সুদ গ্রহণের সম্মতি প্রদান করা যা সম্পূর্ণ হারাম। তাছাড়া সুদ হিসেবে প্রাপ্ত টাকা মূল মুনাফায় মিশ্রিত হয়ে প্রতি শেয়ারারের লভ্যাংশে বিভাজিত হয়ে পড়ে। ফলে প্রত্যেকেই সুদ খাওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হবে।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, যদি সুদের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকে থাকে এবং তা জানা যায়, তাহলে সেই কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা বৈধ হবে না। কিন্তু যদি কোম্পানির এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্ব হতে না থাকে, শেয়ার ক্রয়ের পর যেকোন কারণে এরূপ করা হয়েছে বলে জানা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে A.G.M-এ এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ জানাবে। তাতেও কোন কাজ না হলে, নিজের প্রাপ্য মুনাফার যে পরিমাণ সুদী খাত থেকে এসেছে তা আর্তপীড়িত সাধারণ মানুষের কল্যাণে (সাওয়ারের নিয়ত ছাড়া) ব্যয় করে দিতে হবে। এরূপ কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হলেও অনুত্তম। লভ্যাংশের কত টাকা সুদী খাত থেকে এসেছে তা জানা যাবে কোম্পানির ব্যালেন্স সীট (Balance sheet) বা স্থিতিপত্র দেখে।[১১]

মুদ্রা (MONEY)

মুদ্রার সংগা

যে বস্তু মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হয় এবং যা একটি নির্ধারিত পরিমাণের প্রতীক বা মূল্যমান হিসেবে বিরাজ করে এবং যা দ্বারা মূল্যমান সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় সাধারণত তাকেই অর্থ বা মুদ্রা বলে।

এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Money

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে মুদ্রা দু'ধরনের। যথা ঃ-

এক, প্রকৃত মুদ্রা। তা হলো সোনা-রূপা।

দুই, পারিভাষিক মুদ্রা।

পারিভাষিক মুদ্রা প্রকৃত পক্ষে ধাতব বস্তু। যখন একে মুদ্রা হিসেবে গণ্য বা প্রচলন করা হয়, তখন তা মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত হয়।

সংক্ষেপে, কোন বস্তু মুদ্রা হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য তার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার।

১- বিনিময়ের প্রচলিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার থাকা।

২- তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রতীক হওয়া।

৩- তা দ্বারা মূল্যমান সংরক্ষণ করা সম্ভব হওয়া।

এককালে মানুষ সরাসরি সোনা-রূপার মাধ্যমে বেচা-কেনা করত। অতঃপর কাল-পরিক্রমায় সে ধারা পরিবর্তিত হয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রকৃত মুদ্রা (স্বর্ণ-রৌপ্য) এর পরিবর্তে পারিভাষিক মুদ্রা তথা ধাতব মুদ্রা (পয়সা) ও কাগজি মুদ্রা (নোট)) চালু হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে যেহেতু সোনা-রূপার লেনদেনের ক্ষেত্রে চরমভাবে সমতা রক্ষার বিধান সর্বস্বীকৃত এবং মুদ্রা মূলত সোনা কিংবা রূপার 'গ্যারান্টি কার্ড' রূপে ব্যবহৃত হয়। আর সোনা-রূপা ওজন করে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অতএব মুদ্রার পরিমাণ নির্ধারণের মূল ভিত্তি ওজনের উপর। তাই এর লেনদেনে সমতা রক্ষা করতে হবে। তবে দেশীয় মুদ্রার পরস্পরে গুণগত ও মানগত পার্থক্য ও ব্যবধান না থাকলেও দেশীয় মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে তা পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। তাই মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত মাসআলা বিস্তর আলোচনা সাপেক্ষ। নিম্নে তা কিঞ্চিত তুলে ধরা হলো-

মুদ্রা বিনিময়ের দু'টি অবস্থা

মুদ্রা বিনিময়ের দু'টি অবস্থা। এক, একদেশীয় এক মুদ্রাকে অন্য মুদ্রার মাধ্যমে বিক্রি করা। যেমনঃ- ১০০ টাকার নোটকে ২০ টাকার ৫টি নোটের মাধ্যমে বিনিময় করা।

দুই, এক দেশের মুদ্রার সাথে আরেক দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় করা।

এক দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেন

যেহেতু এক দেশীয় টাকা, এক সরকার শাসিত দেশের সকল নাগরিক সমানভাবে এ মুদ্রাকে ব্যবহার করে থাকে, তাই এটা এক জাতীয় দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এক দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেনে কম বেশি করা বৈধ হবে না। করলে তা সুদ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বরং সমান সমান হতে হবে। আর এই সমতা নোটের গণনার দ্বারা নয় বরং তা (Face value) লিখিত মূল্য অনুযায়ী হতে হবে। কাগজের নোট ও ধাতুর পয়সা উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান

প্রযোজ্য। এক দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা জরুরী হলেও একই বৈঠকে উভয়ের তা গ্রহণ করা জরুরী নয়। তবে যে কোন একটি কব্জা করা জরুরী।

বিদেশী মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়

দুই দেশের মুদ্রার লেনদেন যেমন, টাকার বিনিময়ে ডলার, রিয়াল, পাউন্ড বা অন্যান্য প্রচলিত মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেনে কম বেশি করলে সুদ হবে না। কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে একটির সাথে আরেকটির মূল্যমানের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা হওয়ায় প্রত্যেকটির মধ্যে নামের পার্থক্য তো আছেই। সংগত কারণেই এ ব্যাপারে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলেমগণের অভিমত হলো, দুই দেশের মুদ্রা পরস্পর দুই বস্তু হিসেবে গণ্য হবে। তাই তাতে কম বেশি করা বৈধ। স্বর্ণ-রৌপ্য দুই বস্তু হওয়ার কারণে এগুলোর পারস্পরিক লেনদেন কম-বেশি করলে তা যেমন সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, তেমনি, দুই দেশের কারেন্সী দুই বস্তু হওয়ায় এগুলোর লেনদেনে কম-বেশি করলে অতিরিক্তাংশ সুদ বলে গণ্য হবে না।

উল্লেখ্য, সরকার অন্যান্য দেশের কারেন্সীর সাথে স্বদেশের কারেন্সীর রেট নির্ধারণ করে দেয়। এ রেটের চেয়ে কম-বেশিতে লেনদেন করলে যদিও সুদ হবে না তবে দেশের নীতি বহির্ভূত হওয়ায় ও রাষ্ট্র প্রধানের বৈধ কাজের অনুসরণ না করায় গুনাহগার হবে ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে।[১২]

ঋণ পরিশোধে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া

মুদ্রার একটি মূল্য তার গায়ে লেখা থাকে একে (Face value) বা লিখিত মূল্য বলে। আর তার আরেকটি ক্রয়মূল্য থাকে। একে (Read Value) বা প্রকৃতমূল্য বলে। লিখিত মূল্য সাধারণত একই থাকে কিন্তু প্রকৃত মূল্য মুদ্রাস্ফীতির (মুদ্রার মূল্য হ্রাস) কারণে কমে যায়। এখন প্রশ্ন হল, কোন ব্যক্তি কারো কাছে ঋণী থাকলে কিছু দিন পর তার ঋণ লিখিত মূল্য হিসেবে পরিশোধ করবে না-কি প্রকৃত মূল্য হিসেবে পরিশোধ করবে? যেমন কোন ব্যক্তির ১০০ টাকার ঋণ আছে। এক বছর পর ১০০ টাকার প্রকৃত মূল্য শতকরা ১০ ভাগ কমে গেল। এমতাবস্থায় লিখিত মূল্য হিসেবে ১০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃত মূল্য হিসেবে ১১০ টাকা দিতে হয়। কিন্তু লিখিত মূল্য হিসেবে পরিশোধ করলে 'ঋণদাতার' ক্ষতি ও তার প্রতি জুলুম হবে। অন্য দিকে প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী দিলে ঋণের মূল টাকার চেয়ে কিছু অতিরিক্ত প্রদান করতে হবে। যা কোন বিনিময়হীন বলে সুদে রূপান্তরিত হবে। বর্তমানে বিজ্ঞ আলেমগণের নিকট এটি একটি আলোচিত সমস্যা। নিম্নে এর শরয়ী সমাধান পেশ করা হলো।

মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যহ্রাস দু'ধরনের

১-মুদ্রাস্ফীতি যদি ধারণাতীত ভাবে এমন বেশি হয় যে, তার আগের মুদ্রা ও পরের মুদ্রার মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান এবং এর প্রভাব বিদেশী কারেন্সীর বিনিময় হারের উপর পড়ে। যেমন ঃ- বৈরুতের কারেন্সী লীরা (Lira) এক সময় ডলারের কাছাকাছি ছিল। বর্তমানে এর মূল্য এত

কম যে, এক ডলারে ৬/৭ শত লীরা পাওয়া যায়। এ ধরনের মুদ্রার মারাত্মক মূল্যহ্রাস কখনো সরকার কর্তৃক (কমিয়ে দেয়ার কারণে) হয়ে থাকে। তাকে Devaluation বলে। আবার কখনো মুদ্রাবাজারে মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। যাকে Demand pull inflation বলে।

২- মুদ্রাস্ফীতি সাধারণ পর্যায়ের হওয়া। যার পূর্বাপরের মুদ্রার মাঝে ব্যবধান ও তারতম্য থাকে যৎসামান্য, উনিশ-বিশ, আর তা বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে কোন প্রভাব ফেলে না। এ জাতীয় হালকা মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত পণ্য তৈরীর খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় (যেমন, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি পাওয়া) ঘটে। যাকে (Cost push inflation) বলে।

মুদ্রাস্ফীতির উল্লিখিত দুই প্রকারের মধ্যে প্রথমাবস্থা যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা লিখিত মূল্য অনুপাতে টাকা পরিশোধ করবে না। কারণ এখন ঋণদাতা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং তার উপর অবিচার করা হবে। বরং প্রকৃত মূল্য (বাজারের বর্তমান মূল্য) অনুযায়ী ঋণ শোধ করবে। যেমন, কেউ ১০০ টাকা ৪ ডলারের সমান থাকতে ঋণ নিয়েছিল। পরে সরকার ১০০ টাকার মূল্য কমিয়ে ২ ডলারের সমান করে দিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, ১০০ টাকার মূল্য শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করেছে। এখন সে এই নতুন মুদ্রাস্ফীতি টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করবে। অর্থাৎ ১৫০ টাকা প্রদান করবে।

এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এক দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেনে পরিমাণগত সমতা রক্ষা করা জরুরি। কম-বেশী করলে তা সুদী কারবারে পরিণত হবে-এ স্বীকৃত মাসআলার আলোকে ঋণগ্রহীতার জন্য মুদ্রাস্ফীতি ঘটা সত্ত্বেও লিখিত মূল্য অনুসারেই তার ঋণ শোধ করা উচিত। কেননা যদি প্রকৃত মূল্য অনুসারে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে সেখানে পরিমাণগত সমতা রক্ষা পাবে না। বরং ঋণদাতা যা প্রদান করছে তা থেকে বেশি গ্রহণ করছে। তাহলে এই অতিরিক্তাংশ কি সুদ হিসেবে গণ্য হবে না?

এর উত্তরে আমরা বলব যে, উল্লিখিত অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় ধরে নেয়া হবে যে, মূল্য হ্রাসের আগে এক মুদ্রা ও পরে আরেক (নতুন) মুদ্রা চালু হয়েছে। এবং প্রথম মুদ্রা বাতিল হয়ে নতুন মুদ্রার প্রচলন ঘটেছে। যার মূল্য প্রথম মুদ্রা অপেক্ষা কম। মুদ্রাস্ফীতির আগের মুদ্রা ও পরের মুদ্রার মাঝে লেনদেন যেন দুই দেশের দুই মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেনের নামান্তর। আর দুই দেশের দুই কারেন্সী যেমনি দুই বস্তু হিসেবে গণ্য হওয়ায় এগুলোর পারস্পরিক লেনদেনে কম-বেশি করলে তা সুদ হবে না, তেমনি মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে এর আগের সময়ের ঋণ পরে পরিশোধ করলে তাতে কম-বেশি করা যাবে, সুদ হবে না।

তবে দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ মুদ্রার মূল্যহ্রাস হলে সেক্ষেত্রে পরিমাণগত সমতা রক্ষা করতে হবে। কেননা তখন স্ফীতির আগের সময়ের মুদ্রা ও পরের সময়ের মুদ্রাকে এক দেশীয় মুদ্রা গণ্য করা হবে। তাই কম-বেশী করে লেনদেন করলে তা সুদে পরিণত হবে।[১৩]

বীমা (Insurance)

বীমা অর্থ নিশ্চয়তা, গ্যারান্টি। দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত এক ধরনের আর্থিক চুক্তি, যাতে এক পক্ষ অপর পক্ষকে কিস্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের শর্তে নিশ্চয়তা প্রদান করে এ মর্মে যে চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে অঘটন বা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার জীবন বা সম্পদের ক্ষতি সাধিত হলে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিবে। যে সংস্থা ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্তে বীমাকারী থেকে টাকা গ্রহণ করে তাকে বলে বীমা কোম্পানি।

যে সকল বিষয়ে দুর্ঘটনার মোকাবিলায় ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা করা হয় তা সাধারণত তিন ধরনের। যথা ঃ- (১) দ্রব্যসামগ্রীর বিপরীতে বীমা (Goods Insurance) বাড়ী, গাড়ী, ফ্রিজ, জাহাজ, কম্পিউটার ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (২) দায়-দায়িত্বের বিপরীতে বীমা (Third party Insurance) অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন আর্থিক ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব নিজের উপর গড়াতে পারে এই আশঙ্কায় বীমা করা। (৩) জীবন বীমা (Life Insurance) ভবিষ্যতে আকস্মিকভাবে মৃত্যু এসে যেতে পারে সে জন্য জীবন বীমা করা।

বীমা কোম্পানি তিন ধরনের

- এক, কমার্শিয়াল বীমা ঃ যে কোম্পানি বীমাকারীদের থেকে কিস্তিতে টাকা উসূল করে তা কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে এবং এর মধ্যসত্ব ভোগ ও আর্থিক মুনাফা অর্জনে প্রয়াসী হয় তাকে কমার্শিয়াল বীমা বলে।
- দুই, গ্রুপ বীমাঃ একই পেশায় নিয়োজিত বা একই প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত লোকদের দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেয়ার মানসে তাদের আয়ের কিছু অংশ মাসিক প্রিমিয়াম হিসেবে জমা করে ফান্ড গঠন করা হয়। একে গ্রুপ বীমা বলে।
- তিন, পারস্পরিক সহযোগিতা বীমাঃ ভবিষ্যতে কোন ক্ষতির আশঙ্কায় কয়েকজন লোক মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে কোন ক্ষতি পূরণ প্রকল্প বা ফান্ড গঠন করলে এবং তাতে নিয়মিত কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করলে, তাকে পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা বলে।

ইসলামী আইনে বীমা

উল্লিখিত তিন প্রকার বীমা কোম্পানির মধ্যে কমার্শিয়াল বীমাকে আধুনিক কালের ফিকাহবিদগণ সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এই অবৈধতার পিছনে একাধিক যুক্তি ও কারণ থাকলেও প্রধান কারণ হলো, কমার্শিয়াল বীমা কোম্পানি সুদী কারবারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সুদভিত্তিক লেনদেনে পুঁজি বিনিয়োগ করে। এই কোম্পানিগুলো সুদী ব্যাংকের মত পলিসি হোল্ডারদেরকে স্বল্পহারে সুদ দিয়ে তাদের থেকে প্রিমিয়ামের নামে পুঁজি সংগ্রহ করে। অতঃপর সেই পুঁজি উচ্চ সুদের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে বা অন্য কোন সুদী

প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে। সুতরাং সংগত কারণেই কমার্শিয়াল বীমা কোম্পানীতে পলিসি হোল্ডার হওয়া বা তাতে চাকুরী করা সুদী কারবারে জড়িত হওয়ার নামান্তর।

বিগত ০৪/০৪/১৩৯৮ হিজরীতে রিয়াদে অনুষ্ঠিত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের এক অধিবেশনে এবং ১৩৯৮ হিজরীর শা'বান মাসে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিকহ্ আল ইসলামী' এর অধিবেশনে কমার্শিয়াল বীমা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরব জাহানের আলেমগণসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরামই কমার্শিয়াল বীমা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত।

অবশ্য গ্রুপ বীমা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বীমায় যদি লাভ-লোকসান সদস্যদের মাঝে বন্টিত হওয়ার শর্তে বা বন্টিত না হওয়ার শর্তে বরং পুঁজি গুলোকে ওয়াক্ফ করে দেয়া হয় তাহলে তাতে টাকা জমা রাখা বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো এই ফান্ডের টাকা কোন হালাল খাতে বিনিয়োগ করা চাই। কোন অবৈধ খাত বা সুদের সাথে জড়িয়ে গেলে তা হারাম হবে।

প্রিমিয়াম করে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত গ্রহণ করা

প্রিমিয়াম বা কিস্তির মাধ্যমে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকা বীমা কোম্পানি থেকে গ্রহণ করা পলিসি হোল্ডার বা বীমাকারীর জন্য বৈধ হবে না। কেননা ওটা সুদ হিসেবে গণ্য হয়। তবে নিতে বাধ্য হলে তা নিবে কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করবে না বরং গরীব অসহায়দের সেবা কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে (সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া) ব্যয় করে দিবে।

তথ্যপঞ্জি

১. হিদায়া খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা ১০৯, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খণ্ড-১ পৃষ্ঠা- ৪২১-৪২২।
২. ফিকহী মাকালাত, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা- ২৯৬-২৯৮।
৩. ফিকহী মাকালাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭৭।
৪. সূরা মায়েদা, আয়াত ২।
৫. আল মাবসূত, খণ্ড- ১৬, পৃষ্ঠা- ৩০৯, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১০।
৬. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খণ্ড-১ পৃষ্ঠা- ৪০০।
৭. ফিকহী মাকালাত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ২৬৪।
৮. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৪২২।
৯. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৪২০।
১০. কাওয়ায়েদুল ফিকহ পৃষ্ঠা- ১০২।
১১. ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ২২২, ফতোয়ায়ে জামেয়া, জামেয়া কুরআনিয়া আবারিয়া লালবাগ ঢাকা।
১২. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৫৮৭-৫৯০।
১৩. নূরুল আনওয়ার পৃষ্ঠা ৫৬, মাকতাবাতু মারেফুল কুরআন কর্তৃক প্রকাশিত। ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কিত একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ মাসআলাটি কিয়াস করা হয়েছে। (প্রবন্ধকার)

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৬, পৃষ্ঠা : ৮৬-৯৬

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলাম

কে. এম. মোরতুজা আলী

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলাম

ভূমিকা ঃ

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি বহুল পরিচিত গানের কয়েকটি কলি দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করতে চাই। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

ক. ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্ব করেছি জ্ঞাতি।

খ. উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙ্গি দিল সবারে বক্ষ পাতি
আমরা সেই সে জাতি ৷৷

গ. আমীর ফকিরে ভেদ নাই সবে সব ভাই এক সাথী
আমরা সেই সে জাতি ৷৷

ঘ. নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর-সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া করিয়াছি একাকার।
আধার রাতের বোরখা উতারি এনেছি আশার বাতি
আমরা সেই সে জাতি ৷৷

কবি এখানে সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের প্রতীক হিসেবে ইসলামের তুলনা করেছেন। যেখানে সত্য, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা কোন সমাজ জীবনের লক্ষ্য হয়ে থাকে, সেখানে উচ্চ নীচের, আশরাফ-আতরাফের, আমীর-ফকিরের, নর-নারীর পার্থক্য থাকতে পারে না। মানুষের গড়া সব প্রাচীর ভেঙ্গে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা সেই সমাজের লক্ষ্য।

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম সমাজের সবাইকে ভালবাসতে শেখায়। মানুষের কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা যোগায়। ইসলামের শিক্ষা হল মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সমগ্র মানব জাতি এক পরিবারভুক্ত । পবিত্র কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হতে, পরে

লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইনসিওরেন্স লিমিটেড।

তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।'[১]

পবিত্র কুরআনে মানুষের সাথে মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করা হয়েছে শুধুমাত্র মানুষের তাকওয়া বা খোদা ভীতির ভিত্তিতে। মানুষের মধ্যে যারা খোদাভীরু, তারাই আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান মেনে চলেন। যারা আল্লাহর দেয়া বিধান মানেন তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে মানবতার কল্যাণ। কারণ আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু নেয়ামত দিয়েছেন তা মানুষের জন্য-মানুষের কল্যাণের জন্য।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমারা কি দেখ না, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সে সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন।'[২] আল্লাহ যেহেতু সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণে, মানুষের কাজ হচ্ছে তার সমস্ত মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করবে সে মানুষের কল্যাণের জন্য। মহান আল্লাহ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, 'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর বিরত রাখবে মন্দ কাজ থেকে।'[৩]

একটি সামাজিক সমস্যা

অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি সামাজিক সমস্যা। এই সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ইসলামের রয়েছে বহুবিধ দিক নির্দেশনা। ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে যেমন এই সমস্যা দূরীকরণে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা অবশ্যই আমাদের ঈমানী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনৈতিক বৈষ্যম সমাজে হতাশা, বঞ্চনা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে থাকে। অথচ ইসলামের লক্ষ্য সমাজে শান্তি স্থাপন করা। সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করতে হলে সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিতদের সকল মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। অন্যথায় ইসলামের মৌলিক আদর্শসমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। উৎপাদান, বন্টন এবং ভোগ ব্যবস্থায় ইসলামের আদর্শ প্রয়োগ করা হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

বৈষম্য আল্লাহর কাম্য নয়। তিনি চান সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য। বৈষম্য সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় বিধায় বৈষম্যমূলক সকল বিধি বিধানের অবসান ঘটিয়ে সমাজে ইনসাফ কায়েমের প্রতি ইসলাম ধর্মে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম একটি জনপদের বা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায়। মহানবী স. বলেছেন, 'একটি সমাজের জনগোষ্ঠী একটি সমুদ্রগামী জাহাজের আরোহীদের মত। এই জাহাজে যদি কোন বিপদ আসে তাহলে সে বিপদ একজন আরোহীর জন্য নয়, বরং তা হবে জাহাজের সকল আরোহীর জন্য।"

আমাদের দায়িত্ব

সাধারণত সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষেরা তাদের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের অপেক্ষাকৃত সক্ষম ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে সামাজিক কল্যাণের লক্ষে সকল অন্যায় ও অবিচারের মূল উৎপাটনে কার্যকর ভূমিকা রাখা। এজন্য আল্লাহ আহবান জানিয়েছেন মুসলমানদের প্রতি যেন তারা মানুষকে সার্বিক কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে থাকে এবং মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে থাকে।[৪]

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দায়বদ্ধতা। সমাজের সকল সদস্যকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা, মানুষের কল্যাণের জন্য ভালো কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে নিজেদের গড়ে তোলা হচ্ছে মানুষের প্রধানতম দায়িত্ব। ইসলাম মানুষকে সদাচরণ শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে অসহায় ও মজলুম মানুষকে সাহায্য করা এবং জালিমকে বাধা দেয়া মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

মহানবী স. বলেছেন, 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালিম হোক অথবা মজলুম।'[৫] সাহাবীগণ জালিমকে সাহায্য করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে নবী করীম স. বলেন, জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা। ইসলাম মানব সমাজ থেকে সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার বন্ধের জন্য কার্যকর বিধান দিয়েছে। ইসলামী সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে বঞ্চনামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মুক্ত এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে মানুষ একে অপরকে ভালবাসবে, একে অন্যের সহযোগিতা করবে, সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করবে। সব মানুষ এক হয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করবে।

অর্থনৈতিক বৈষেম্যের কারণ

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামের দিক-নির্দেশনাসমূহ চিহ্নিত করার পূর্বে আমরা বৈষম্যের কারণসমূহ চিহ্নিত করতে আগ্রহী। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে কল্যাণমুখী সমাজ কায়েম যদি আমাদের কাম্য হয় তবে মুসলিম সমাজে এই ব্যবধান কমিয়ে আনতে হলে বর্তমান অবস্থার মূল কারণসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে। একটি সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য যে সব কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে।

ক. অবৈধ পন্থায় আয় ঃ ইসলাম হালাল বা বৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ অর্জনকে উৎসাহিত করেছে কিন্তু হারাম বা অবৈধ পন্থায় উপার্জনের কোন অনুমতি দেয়নি। আমাদের সমাজে অবৈধ পন্থায় আয় উপার্জন করার পথে কার্যকর কোন বাধা নেই। ফলে একশ্রেণীর অসৎ মানুষ অন্যকে বঞ্চিত করে ধন-সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করে তোলে। এর ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তে থাকে।

খ. প্রতিরোধ ও প্রতিকারের অভাব ঃ সামাজিক সুবিচার কায়েমের কোন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা না থাকার ফলে দুর্নীতি, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, মজুতদারী বেড়ে যাচ্ছে। ফলে দরিদ্র ও ধনীর বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনে অনীহা ঃ জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে না ওঠার ফলে আমাদের মধ্যে কৃপণতা ও ভোগ লিপ্সার মত চরম পন্থা অবলম্বনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব থেকেই সমাজে অন্যায়, অবিচার, জুলুম নির্যাতন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

ঘ. মৌলিক প্রয়োজন পূরণে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা ঃ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কার্যকরী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি না থাকার ফলে দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেস্টনী ও ভিত্তি রচিত হয় না, ফলে অসহায় মানুষের পক্ষে দারিদ্র্যের ভীষণ চক্র থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না।

সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলামের মৌলিক নীতি হচ্ছে এই যে, সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহর। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে শুধুমাত্র আমানতী মলিকানা ভোগ করে। মানুষকে স্বেচ্ছাধীনভাবে ইচ্ছে মতো সবকিছু অর্জন ও ভোগ করার অধিকার মহান আল্লাহ দেননি। পবিত্র কুরআনে সম্পদের অর্জন, ব্যবহার, ভোগ ও বণ্টন সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এইব সব দিক-নির্দেশনার বিষয়ে আমরা কিছুটা আলোকপাত করব ঃ

ক. অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা যাবে না ঃ আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য যদি-পরস্পরের অনুমতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই।'[৬]

খ. সুদ ভিত্তিক কোন ব্যবসা বা বিনেয়োগ করা যাবে না ঃ আল্লাহ সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ সুদ মানুষকে অন্যায়ভাবে শোষণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'[৭]

গ. সম্পদ পুঞ্জিভূত করা ও অলস ফেলে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঃ পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা: 'যারা স্বর্ণ, রোপৌ, টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও।'[৮] আল্লাহ আরো বলেছেন, 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।'[৯]

ঘ. বিত্তশালীদের সম্পদে অভাবগ্রস্তদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদের ধন-সম্পদে (বিত্তশালীদের) প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।'[১০]

ঙ. যাকাত ও ওশর প্রদানকে ফরয ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ঃ পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে নামাযের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের জন্য বার বার তাগিদ ও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

চ. উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বন্টন ঃ পবিত্র কুরআনে বিস্তৃত ও নিখুঁত পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির ধন সম্পদের নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের মীরাসী আইন সম্পদ বন্টনের একটি বৈজ্ঞানিক ও মানবিক নীতিমালা নিরূপণ করে দিয়েছে।

ছ. উপার্জন, ভোগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম হারাম হালালের সীমারেখা টেনে দিয়েছে ঃ হালাল দ্রব্য বৈধ পন্থায় আয় ও ব্যয় করার জন্য মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। জুয়া, ফটকাবাজারি ও প্রতারণামূলক সকল লেনদেন ও উপার্জনকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। কেননা এসবের মাধ্যমে মানুষকে ঠকানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের উপায়

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের তিনটি মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে। তিনটি পদ্ধতি বা উপায় একসাথে একযোগে কার্যকর করা না হলে এর সুফল সমাজে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন দুর্নীতির মত ভয়াল রোগ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না কারণ এখানে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই বাস্তবতার আলোকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে ব্যক্তি হিসেবে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে এবং রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমার কি কি করণীয়। ইসলামী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী হতে হলে অবশ্যই আমার জীবনাচারণে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। ব্যক্তি হিসেবে আমি যদি সৎ ও সুন্দর শরীয়া ভিত্তিক জীবনের অভিলাষী হই তবে আমাকে একই সাথে পরিবার ও সমাজের সকল সদস্যদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

ইসলামী জীবন বিধানের মূল কথা হলো মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। ইসলাম সকল মানুষকে সদাচারের শিক্ষা দেয়। বিশেষ কর সমাজের অসহায় ও অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মহানবী স. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দুঃখ কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন।'[১১] তিনি আরো বলেছেন, 'কোন লোকই মুমিন বা বিশ্বাসী হতে পারবে না যে পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।'[১২]

প্রতবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া একজন বিশ্বাসীর জীবনে এক অপরিহার্য কর্তব্য। গরীব প্রতিবেশীকে দান করা এবং অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। নবী মুহাম্মদ স. বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তি সহকারে পানাহার করে অথচ তার প্রতিবেশী পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়।'[১৩] প্রতিবেশী যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের বা যে কোন আদর্শের অনুসারী হোক না কেন সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য ইসলাম মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রতিবেশীদের মত অধীনস্থদের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী স. অধীনস্থদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে বলেছেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে থাকে।'[১৪] একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমাকে বুঝতে হবে যে বৈধ উপায়ে পার্থিব সম্পদ অর্জনে ইসলাম ধর্মে কোন বাধা নেই কিন্তু ভোগ-লিপ্সা অর্থ-সম্পদ অর্জনের লক্ষ নয়। পরকালীন সাফল্য অর্জন মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। ভোগের মানসিকতা বর্জন কর ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরআন শরীফে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন এর দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর।'[১৫] পার্থিব অর্জনকে আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় তা ব্যয় করা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ সম্পদ অর্জন করতে হবে শুধুমাত্র জীবন ধারণের উপায় হিসেবে; জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ হিসেবে নয়।

সম্মিলিত উদ্যোগ

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে ইসলাম যাকাত আদায়ের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। যাকাতের অর্থ এবং উশরের ফসল একত্র করে সুষ্ঠু বন্টনের দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বিপ্লবী ভূমিকা রাখা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। অথচ এদেশের অধিকাংশ মানুষ যাকাতের বিলি বন্টন করেন ব্যক্তিগতভাবে এবং অপরিকল্পিতভাবে। অথচ সমাজে ধন বৈষম্য হ্রাস এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সম্মিলিত ও পরিকল্পিত যাকাত বন্টন ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে।

একইভাবে প্রতিবছর কোরবানীর চামড়া সম্মিলিত উদ্যোগে সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করা হলে মূল্য সংযোজনসহ এর মূল্য হবে বছরে আনুমানিক কয়েক হাজার কোটি টাকা। বিত্তশালী ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে কোরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুসরণের মাধ্যমে তা দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সব অর্থ ব্যয় করা হয় সেসব অর্থ সম্মিলিতভাবে কোন সংস্থার মাধ্যমে একত্রিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজে লাগানো সম্ভব।

শরীয়া সম্মত পদ্ধতিতে দরিদ্র মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে সম্মিলিত সঞ্চয়ের অর্থ শরীয়া পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হলে এবং শরীয়ার অনুসরণে সমবায় ভিত্তিক ঝুঁকি নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দূরবস্থার অবসান ঘটবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনে করজে হাসানা এবং মুদারাবা ভিত্তিক বিনিয়োগ করা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন হবে

এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, উৎপাদন বাড়বে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিসীম। একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক বৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করছে কি না তা দেখা এবং নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি যাতে হালাল উপার্জনে রত হয় এবং নিষ্কর্মা বসে না থাকে তা দেখা ইসলামী রাষ্ট্রের ও সরকারের কর্তব্য। নাগরিকদের উপার্জিত ধন সম্পদ যাতে ধনী গোষ্ঠীর করায়ত্ত না হয় এবং মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে না পারে তা নিশ্চিত করাও ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব। ধন সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় মূলত সরকারের ভ্রান্তনীতির কারণে। সরকারের নীতিসমূহে শরীয়ার আইন প্রতিফলিত হয় না বলেই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামের ভূমিকা প্রতিভাত হয় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং মানবীয় আবেদনের বিষয়টি নীতি নির্ধারকগণ প্রায়শই উপেক্ষা করেন। একটি আদর্শ ইসলামী সরকারের নীতি নির্ধারকদের উচিত হবে সীমিত সম্পদের দক্ষ এবং ন্যায়ানুগ বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থনীতিতে নীতি ও নৈতিকতার অবসান নয় বরং সার্থক ও সার্বক্ষণিক প্রয়োগ ঘটাতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অপ্রয়োজনীয় এবং অপচয়মূলক ভোগ দূর করতে হবে। জনগণের নৈতিক মানদণ্ড উন্নয়নের দ্বারা সমাজের স্বার্থ রক্ষায় তাদেরকে উদ্দীপ্ত করতে সরকারকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যা কিছু অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, আয় ও সম্পদের ক্রমবর্ধমান অসমতা এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক অস্থিরতার মত চড়া মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। অতএব ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানুষকে নীতি ও নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করা যাতে করে ভোগ নয় ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হয় আমাদের জীবন।

যদি আমরা ইসলাম নির্দেশিত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে চাই তবে মানুষের ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত আচরণগত পরিবর্তন আনতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। মানুষ যেন সর্বোত্তম কাজ করে সেজন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে এবং অনুপ্রাণিত করতে হবে। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যদি এক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপনে ব্যর্থ হন তবে জনগণ উৎসাহিত হবে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে আদর্শ স্থাপনের ক্ষেত্রে যে সংকট তা কাটিয়ে না উঠতে পারলে শুধুমাত্র ধর্ম উপদেশ সাধারণ মানুষকে নীতি-নৈতিকতার দিকে ধাবিত করে না। নেতৃবর্গ যদি ইসলামী ধ্যান-ধারণা বা চিন্তা-চেতনার সাথে পরিচিত না হন তাহলে তাদের পক্ষে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় না।

একথা সত্য যে একটি মুসলিম প্রধান দেশে মুসলিম জনগণ তাদের মূল শিক্ষা বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে। আজকে তাই প্রথম প্রয়োজন ইসলামী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সমাজ সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেয়া। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে মানবীয় উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মানব সম্পদের উৎকর্ষ সাধন করা। মসজিদ ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নৈতিক সংস্কার অনেক সহজ হবে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে মূল্যবোধ এবং নীতি নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যদি সরকার সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার প্রতি সমান ভাবে ইসলামের দিক-নির্দেশনার আলোকে উপযুক্ত আইন প্রয়োগ না করে তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ হবে সুদূর পরাহত।

সরকারের করণীয়

সরকারের নীতিসমূহে অসামঞ্জস্যতা এবং অসঙ্গতির ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দ্রুত বিকাশ লাভ করে থাকে। এ কারণে সরকারের নীতিসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। কোন ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করা হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব তা আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের প্রকৃত আয় বাড়ানো সম্ভব হয়। দরিদ্র মানুষের প্রকৃত আয় না বাড়লে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দরিদ্র জনসাধারণের নিকট মূল্যহীন।

খ. শ্রমিক-কর্মচারীর মান উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতম উৎপাদনশীলতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

গ. ব্যবস্থাপনায় এবং লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে আদর্শ ইসলামী সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংক, বীমা ও অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। এবং এভাবে সুদের শোষণ থেকে দরিদ্র মানুষকে রক্ষা করতে হবে।

ঙ. মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্তভাবে বিস্তার ঘটাতে হবে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রকৃত বিশ্বাসী ও খাঁটি মুসলমানের গুণাবলী অর্জনের জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে। ইসলামের যাকাত ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে।

চ. দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য কারিগরি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

ছ. উন্নয়ন পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কেননা অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ কৃষিজীবী এবং পল্লীবাসী। গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

জ. সম্মিলিতভাবে যাকাত সংগ্রহ এবং সমন্বিত বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ঝ. উচ্চবিত্তদের বিলাসী জীবন যাপনকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং এজন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বড়লোকী জাহির করার মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চমূল্যের বিলাস দ্রব্যের আমদানি ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ব্যয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

ঞ. ইসলামী শরীয়তের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ইসলামী 'উন্নয়ন-দর্শন' প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই আলোকে জাতীয় অর্থনীতির সুষম বিকাশ ঘটাতে হবে। এই উন্নয়ন দর্শনের মূল লক্ষ্য হতে হবে সাধারণ মনুষের সার্বিক কল্যাণ এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করা। এই লক্ষে ইসলামী শরীয়তের কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার নিরূপণ করতে হবে।

ট. সর্বশেষ কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণকে বিশেষ করে শিক্ষিত, সুবিধাভোগী, ব্যবসায়ী ও আমলাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত করতে হবে। এর ফলে সমাজ হতে দুর্নীতি ও লোভের মত মারাত্মক ব্যাধি দূর করা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সহজ হবে।

জবাবদিহিতা

সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা (আল্লাহর নিকট) সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি আল্লাহভীরু সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার যদি আল্লাহভীরু না হয় এবং সরকার আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ (জনগণের কল্যাণের জন্য) এ চেতনা তাদের মধ্যে জাগরুক না থাকে তবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনা সৃষ্টি করা বাস্তবে সম্ভব নয়। আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনা সরকারের আছে কিনা তা বুঝতে হলে ইসলামী শরীয়তের বিধান মেনে চলতে সরকার কতটুকু আগ্রহী এবং তাদের আন্তরিকতা কতখানি তার উপর নির্ভর করে। শরীয়তের বিধান মেনে চললে সরকারকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের দক্ষ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত কল্যাণে সরকারকে ব্রতী হতে হবে। মহানবী স. বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকে এক একজন রাখোল যাকে তার অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।'[১৬] তিনি আরো বলেছেন, 'শেষ বিচারের দিন আল্লাহর নিকটতম এবং প্রিয় ব্যক্তি হবে ন্যায়-পরায়ণ শাসক এবং হতভাগ্য জালেম শাসক আল্লাহর নিকট থেকে দূরে থাকবে।' আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনা পার্থিব ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের তুলনায় পরকালের অনন্ত জীবনকে সুন্দর করার আগ্রহ সৃষ্টি করে। যাদের মধ্যে এ চেতনা থাকে তাদের পক্ষেই লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ

একটি সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে সহজ হবে যদি সরকার ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করে। সুবিচার ও মানব কল্যাণ ইসলামী আদর্শের মূলনীতি। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় কর্ম-কৌশল হতে হবে ইনসাফ বা সুবিচার কায়েম। ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে আরো গরীব করা যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফসল হয় তবে সেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য কখনোই দূর করা সম্ভব হবে না। বঞ্চিত ও দরিদ্রদের প্রতি কল্যাণের হাত প্রসারিত করা ইসলামী অর্থনীতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সমাজে আয় ও ধন বন্টন কিভাবে হবে তার মূলনীতিগুলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পরিষ্কার করে বলেছেন, 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।'[১৭] তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।'[১৮] এ কারণেই ইসলাম ধর্মে যাকাত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে ধনীদের সম্পদ গরীব, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, ক্রীতদাসদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করে তা বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করা হলে তা দারিদ্র্য-বিমোচনে ও বৈষম্য দূরীকরণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যাকাত আদায় ও বন্টন রাষ্ট্রীয়ভাবে করার পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের প্রধান কাজ হবে সুদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ। আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সুদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত থাকে এবং ধনী-গরীবের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়। সুদমুক্ত অর্থনীতি চালু হলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশ দূর করা সম্ভব হবে। যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সুদী ব্যবস্থার অবসান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রধানতম দুই হাতিয়ার। যে কোন কল্যাণমুখী সরকারের উচিত হবে ইসলামী অর্থনীতির এই দুটি মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে ইনসাফ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা। এর ফলে সমাজ হতে জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অবিচার দূর করা সম্ভব হবে এবং সাম্য ও মৈত্রীর সমাজ কায়েম হবে। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সরকার গঠনে নিজের দায়িত্ব পালন করা।

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা হুজুরাত, ৪৯:১৩।
২. সূরা লোকমান ৩১:২০।
৩. সূরা আল-ইমরান ৩:১১০।
৪. সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪।
৫. বুখারী ও মুসলিম।

৬. সূরা নিসাঃ ২৯ আয়াত।
৭. সূরা বাকারা ২৭৫ আয়াত।
৮. সূরা তওবা ৩৪ আয়াত।
৯. সূরা হাশর, আয়াত-৭।
১০. সূরা আল-জারিয়াহ ১৯ আয়াত।
১১. মুসলিম।
১২. বুখারী ও মুসলিম।
১৩. বায়হাকী।
১৪. বুখারী ও মুসলিম।
১৫. সূরা কাসাস ২৮ঃ৭৭।
১৬. বুখারী ও মুসলিম।
১৭. সূরা হাশর আয়াত ৭।
১৮. সূরা বনি ইসরাইল ২৬-২৭।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬ পৃষ্ঠা : ৯৭-১০১

কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে মুসলিম পারিবারিক আইনের সপ্তম ধারা

মুফতী মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর তালাক সংক্রান্ত সপ্তম ধারার অধীনে উল্লেখিত প্রায় সকল উপধারা কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিরোধী।

তালাক সংক্রান্ত ৭নং ধারায় কুরআন-হাদীসের মোট সাতটি সুস্পষ্ট হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে প্রত্যেকটি লংঘনের প্রমাণ হিসেবে কুরআন-হাদীসের দলীল পেশ করা হচ্ছে।

১. ইসলামী শরীয়ত কিছু শর্ত সাপেক্ষে পুরুষকে একচ্ছত্র তালাকের অধিকার দিয়েছে। কাউকে অবগতি কিংবা কারো অনুমতির উপর নির্ভরশীল করেনি। পক্ষান্তরে মুসলিম পারিবারিক আইন পুরুষের তালাকের অধিকারকে চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছে। কুরআন মজীদের যত স্থানে তালাকের বিবরণ এসেছে সব স্থানেই তালাকের হুকুম পুরুষ সম্বোধন করেই এবং পুরুষের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(ক) 'যদি সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্য রাজাআত করা {আবার বিবাহ বন্ধনে ফিরে আসা} দোষণীয় হবে না।'[১]

(খ) 'যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে অতঃপর তারা ইদ্দত পুরা করবে..... ।[২]

(গ) 'তোমাদের জন্য দোষণীয় নয় যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে......... ।'[৩]

২. মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে, 'তালাকের পর সালিশ কাউন্সিলকে অবহিত করবে, অতপর কাউন্সিল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করবে।' অথচ কুরআনে কারীম বলছে তালাকের আগেই সালিশ কাউন্সিল ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

'যদি তোমরা তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ/অবাধ্যতার আশংকা কর তাহলে স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে বিচারক প্রেরণ কর। যদি তারা সংশোধন হতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে দিবেন।[৪]

৩. মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে, 'ইদ্দত (৯০দিন) অতিবাহিত হওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা হয়ে গেলে সালিশ কাউন্সিল তাদেরকে মিলিয়ে দিতে পারে। স্বামী নিজেও স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিতে পারে। অর্থাৎ চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ প্রদানের দিন হতে নব্বই দিন অতিবাহিত

লেখক : মুফতী ও অধ্যাপক ইসলামিক দাওয়া সেন্টার, ঢাকা।

হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হবে না। এমনকি সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী যার সাথে এখনো নির্জনবাস হয়নি তাকেও তালাক দিলে ৯০ দিনের আগে কার্যকরী হবে না। ৯০ দিনের আগে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।' অথচ কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, যে স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়নি তাকে তালাক দেয়ার সাথে সাথেই সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং তাকে (অন্যত্র বিবাহের জন্য) ইদ্দত পালন করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিনা নারীদেরকে বিবাহ করবে অতপর তাদের স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিবে তাহলে তাদেরকে তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে না...।'[৬]

তদ্রুপ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে তালাক প্রয়োগমাত্রই কার্যকরী হয়ে যায়।

'তিনটি বিষয়ে দৃঢ়তা দেখালে দৃঢ়তা ধরা হবে এবং ঠাট্টা করলেও তা দৃঢ়তা বলে গণ্য হবেঃ বিবাহ, তালাক এবং রাজআত।[৭]

৪. বর্ণিত অর্ডিনেন্সে চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ পৌছার দিন থেকে ইদ্দত গণনা শুরু হয়। অথচ কুরআন সুন্নাহর বিধান হল, তালাকের সময় থেকেই ইদ্দত গণনা শুরু হবে। আল্লাহতাআলা বলেন, 'হে নবী! যখন আপনি আপনার কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে মনস্থ করবেন, তখন তাকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন।'[৮]

এ আয়াতে যেমন পবিত্রতার সময় তালাক দেয়ার নির্দেশ পাওয়া যায় তেমনিভাবে এটাও বুঝে আসে যে, তালাকের পর পরই ইদ্দত শুরু হয়ে যায়।

সূরা বাকারার এক আয়াতে এসেছে ঃ

'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন করু' (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনের জন্য) অপেক্ষা করবে।[৯]

এখানে তালাক প্রাপ্তা মহিলাদেরকে কালক্ষেপন ছাড়াই ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে।

৫. তালাক প্রাপ্তা মহিলা ঋতুবতী হলে তার ইদ্দত তিন ঋতুস্রাব। যা ৯০ দিনের অনেক বেশীও হতে পারে। কিন্তু বর্ণিত অর্ডিনেন্সে ব্যাপকভাবে ৯০ দিন ধার্য করা হয়েছে যা সরাসরি কুরআন বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন করু' (ঋতুস্রাব) পর্যন্ত (ইদ্দত পালনের জন্য) অপেক্ষা করবে।'[১০]

৬. স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলে বর্তমান অর্ডিনেন্সে ৯০ দিন অথবা প্রসব যেটি বিলম্বে হবে সেটিকে ইদ্দত হিসাবে গণ্য করা হয়। অথচ কুরআনুল কারীম সুস্পষ্টভাবে সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব তা ৯০ দিনের কম/বেশী হোকনা কেন পর্যন্তই ইদ্দতের সময়সীমা ধার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

'আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।'[১১]

৭. বর্তমান আইন বলে, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর এ জাতীয় তালাক তিনবার একইভাবে কার্যকরী না হলে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বিবাহ না করেই প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। যদিও একত্রে তিন তালাক দেয়া হোকনা কেন।

ক. হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের নিকট ছিলাম। সেখানে একজন লোক এসে বলল, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে।........তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। আমি তোমার কোন পথই দেখছি না। তুমি তোমার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার জন্য বায়েন হয়ে গেছে।'[১২]

খ. হযরত নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, সে তার প্রভুর অবাধ্যতা করল এবং তার থেকে তার স্ত্রী বায়েন হয়ে গেল।'[১৩]

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত দলীলাদি দ্বারা এসকল বিষয় প্রমাণিত। সুতরাং ৭নং ধারার আওতাধীনে প্রায় সকল উপধারায়ই শরীয়ত স্বীকৃত ধারা সমূহ সংযোজন বা সংশোধন করা প্রয়োজন।

নিম্নে প্রস্তাবিত শরীয়ত সম্মত ধারাসমূহ উল্লেখ করা হল ঃ

প্রস্তাবিত ধারা সমূহ ঃ

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর তালাক সংক্রান্ত সপ্তম ধারার অধীনে উল্লেখিত সকল উপধারা শরীআহ বিরোধী। সেহেতু বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে তালাকের অপব্যবহারকে সামনে রেখে উক্ত ৭ নং ধারার পরিবর্তে শরীআহ নির্দেশিত কিছু ধারা প্রস্তাব করা হচ্ছে ঃ

ধারা-১ সালিশি কাউন্সিল

ক. সালিশি কাউন্সিলে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলে নোটিশ দিতে হবে।

খ. সালিশি কাউন্সিল নোটিশ পাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আপস করার চেষ্টা করবে।

গ. স্থানীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কাউন্সিলে কমপক্ষে দুজন বিজ্ঞ আলেম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তারা উভয় পক্ষের অভিভাবকের মনোনীত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঘ. সালিশি কাউন্সিলকে অবহিত করার আগেই যদি কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তা তাৎক্ষণিক কার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু এ সংক্রান্ত ক নং উপধারা লংঘন করার কারণে লঘু শাস্তির বিধান করা যেতে পারে।

ধারা-২ তালাক ঃ

ক. কেউ স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিতে পারবে না।

খ. যদি কেউ ২/ক নং উপধারা লংঘন করে তবে প্রদত্ত তালাক অবশ্যই কার্যকর হয়ে যাবে।

গ. ক নং উপধারা লংঘন করার কারণে শারীরিক ও আর্থিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ঘ. নিকাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রি, নোটারী পাবলিক ও এসকল নিবন্ধনকারীগণের মাধ্যমে লিখিত তালাক দিতে চাইলে তারা ২/ক উপধারার লংঘনকে বাধা দিবে। সমর্থন দিতে পারবে না।

ঙ. নিবন্ধনকারীগণ ২/ঘ নং উপধারা লংঘন করলে শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

প্রস্তাবের পক্ষে প্রমাণ

১/ক,৩ তালাকের আগে সালিশি কাউন্সিলকে অবহিত করা প্রসঙ্গে ঃ

(মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ/অবাধ্যতার আশংকা কর তাহলে স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে বিচারক প্রেরণ কর...।' (সূরা নিসা ঃ ৩৫) ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীর 'আল-জামেউল আহকামিল কুরআন' ৫/১১৫-এ বলেন, অর্থাৎ 'যদি তোমরা তাদের সহাবস্থান ও সংসার সম্পর্কের অবনতি আশংকা কর।' এতে আরো উল্লেখ রয়েছে-অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে এখানে আশংকা বলতে বিচারক বুঝানো হয়েছে, কেননা বিচারক হতে হবে স্বামী এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে যারা স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা সম্পর্কে এবং খোর-পোষ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।)

২/ক,খ তিন তালাক দেয়া গুনাহ, তবে তা কার্যকর হয় ঃ

(ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে হযরত নাফে' থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, সে তার প্রভুর অবাধ্যতা করল এবং তার থেকে তার স্ত্রী বায়েন হয়ে গেল।

এ হাদীসটি আবদুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে (৬/৩৯৫ পৃষ্ঠা) হযরত সালেম এর সূত্রে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে (৬/৩৯৭ পৃষ্ঠা) হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আব্বাস, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। তখন ইবনে আব্বাস বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে আহাম্মকের মত তালাক দিল। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রভুর অবাধ্যতা করেছো এবং তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। (দেখুন, আল-ইসতিযকার, ইবনু আব্দুল বার ১৭/৭; অধ্যায় ঃ তিন তালাক প্রসঙ্গে।)

২/গ একত্রে তিন তালাক দেয়ার কারণে প্রদত্ত শাস্তি

(মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো এবং গুনাহ ও শত্রুতার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। {সূরা মায়েদা ঃ ২}

ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে (৪/১১) বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমরের কাছে এমন কোন লোক আসত যে তার স্ত্রীকে একই মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে, তখন তিনি সেই লোককে লাঠি পেটা করতেন এবং তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন।

এতে আরো বর্ণিত হয়েছে-৪/১২ হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। মদীনায় এক কর্মহীন বাচাল লোক ছিল, সে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দেয় এরপর হযরত উমরের নিকট এসে বলে, আমি তামাশা করেছিলাম। তখন উমর তার মাথায় দুররা মারেন এবং তাদেরকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

(আব্দুর রায্যাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে ৬/৩৯৬ হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ঈষার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আনাস বিন মালেককে বলতে শুনেছেন, যখন হযরত উমর এমন কোন

লোক পেতেন যে তার স্ত্রীকে সে একই মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে, তিনি দোররা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করতেন।

এ বর্ণনাটি ইবনু আব্দুল বার তাঁর আল-ইসতিযকার গ্রন্থের ১৭ অধ্যায়ে, তিন তালাক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম জাসসাস তাঁর আহকামুল কুরআনে ১/৩১৩ উল্লেখ করেছেন।

দেখুন-মাজমুআতু কাওয়ানীনে ইসলাম, ড. তানযীলুর রহমান; মুআশারাতি মাসায়েল, মওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্বলী; ইসলামকে আয়েলী কাওয়ানীন, মওলানা মুফতী তকী উসমানী।

ড. আব্দুল কাদের আওদা-এর আততাশরীঈল জিনাঈ আল-ইসলামী গ্রন্থে ১/১২৮ উল্লেখ করা হয়েছে-এটি সর্বসম্মত অভিমত যে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি (তাযীর) এমন সব অপরাধে দেয়া যায় যাতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি এবং জরিমানা (কাফ্ফারা) নির্ধারিত নেই, সে অপরাধ আল্লাহর বা বান্দার হকের ব্যাপারে হয়ে থাকে।

দেখুন-আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, আল-মাওয়ারদী, মৃত্যু ৪৫০ হি.পৃ.২৯৩। এছাড়াও ফিকহ-এর গ্রন্থাদি তাযির অধ্যায়, যেমন রদ্দুল মুহতার, বাদায়ে সানায়ে', ফতহুল কাদীর এবং আল-বাহরুর রায়েক।

তথ্যপঞ্জি :

১. সূরা বাকারা ঃ ২৩২।
২. সূরা বাকারা ঃ ২৩২।
৩. সূরা বাকারা ঃ ২৩৬।
৪. সূরা নিসা ঃ ৩৫।
৬. সূরা আহযাব ঃ ৪৯।
৭. আবু দাউদ।
৮. সূরা তালাক ঃ ১।
৯. সূরা বাকারা ঃ ২২৮।
১০. সূরা বাকারা ঃ ২২৮।
১১. সূরা তালাক ঃ ৪।
১২. আবু দাউদ।
১৩. ইবনে আবী শায়বা, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ১০২-১০৫

'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল, ২০০৬' : প্রাসঙ্গিক কথা

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল, ২০০৬ নামে একটি আইন জাতীয় সংসদে উত্থাপনের মাধ্যমে কণ্ঠভোটে তা পাস করিয়ে নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকাসহ গণ মাধ্যমসমূহে খবরটি ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ আইনটি পাস হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকার যখন তখন যে কোন নাগরিকের ফোনে আড়ি পাতার অবাধ সুযোগ পাবেন। এর ফলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা দারুণভাবে লঙ্ঘিত হবার আশংকা রয়েছে। আর তাই এ নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্ক।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ২০০১ সালের মূল টেলিযোগাযোগ আইনে টেলিফোনে আড়িপাতার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু নতুন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে যে কোন টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবহারকারীর পাঠানো বার্তা, কথোপকথন প্রতিহত বা রেকর্ডে ধারণ বা এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সরকার গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা বা আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের যেকোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে এবং এ কাজে সার্বিক সহায়তা করতে পরিচালনাকারীকে নির্দেশ দিতে পারবে। আরও উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে তদানিন্তন সরকারের সময় পাস হওয়া টেলিযোগাযোগ আইনে আড়িপাতার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০৬ সালের সংশোধিত বর্তমান আইনে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীকে আড়িপাতার অধিকার দেয়া হয়েছে।

এ আইনের অনেক বিষয়ই অস্বচ্ছ। এ আইনের অপব্যবহার করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দেশের যে কোন নাগরিককে নানাভাবে হয়রানি করতে পারবেন। ফলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার বদলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সাম্প্রতিককালে দেশে ইসলামী জঙ্গীবাদের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক নিরাপত্তাও দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। সরকার মূলত এ জঙ্গীবাদের উত্থানকে রহিত ও প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে এ আইনটি প্রণয়ন করেছেন বলে জানা গেছে। সরকারের যুক্তি হল এই যে, দেশের সাধারণ নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর এ স্বার্থেই ইসলামী জঙ্গীবাদের চলমান বীভৎস নেটওয়ার্ক

লেখক, আইনবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

গুড়িয়ে দেয়া অত্যাবশ্যক। আর এটি করতে হলে সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্রমূলক গোপন টেলিফোন সংলাপসমূহ দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হওয়া জরুরী প্রয়োজন। এর যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে যে, আজকের দিনে সন্ত্রাসীদের যে কোন ধরনের নাশকতামূলক অপতৎরতার প্রস্তুতি পর্বে সন্ত্রাসীরা টেলিফোনের মাধ্যমেই আন্তঃযোগাযোগ সম্পাদনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করে।

আইনটির বিপক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছেন তাঁদের মতে সরকার টেলিফোনে আড়িপাতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হরণ করছেন। বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক ও স্পর্শকাতর। নাগরিকের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো তাঁর একান্ত নিজস্ব। সরকার এতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি জানার কোন অধিকারও সরকারের নেই। তাঁদের মতে,

ক. এ আইন ব্যক্তি স্বাধীনতায় অবৈধ হস্তক্ষেপ,

খ. এ আইন মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী,

গ. এটি সংবিধান বিরোধী একটি কালা কানুন।

কেননা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে বলা হয়েছে,

অনুচ্ছেদ ৪৩ ঃ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে আরও বলা হয়েছে,

অনুচ্ছেদ ২৬ (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। (২) রাষ্ট্র এ ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, উনিশতম ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় মিসরের রাজধানী কায়রোতে, ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত। এতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ঐতিহাসিক 'কায়রো ঘোষণা' (Cairo Declaration) নামে পরিচিত। এ ঘোষণায় বলা হয়,

ধারা ঃ ১৮ (খ) প্রত্যেকেরই জীবন-যাপন ও কাজকর্মে, নিজ বাড়িতে, নিজ পরিবারে, নিজ সম্পত্তির ব্যাপারে এবং আত্মীয়তা বা অন্য সম্পর্কের (Relationship) ক্ষেত্রে গোপনীয়তা (privacy) বজায় রেখে নিরূপদ্রবে থাকার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তির উপর গুপ্তচরবৃত্তি, তাকে কড়া নজরে বা পাহারায় রাখা অথবা তার সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কোন

কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্র তাকে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক যে কোন রকম অবৈধ হস্তক্ষেপ (arbitrary interference) থেকে রক্ষা করবে।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রেও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

ধারা ঃ ১২ কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশীমত হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কারো সম্মান ও সুনামের উপরও ইচ্ছামত আক্রমণ করা চলবে না।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে ইসলাম

ইসলাম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। এ ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশ ঃ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্যের বাড়িতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে, সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।' (সূরা আন নূরঃ ২৭)

আল কুরআনের আরও ঘোষণা ঃ

'তোমরা একে অপরের গোপন ক্রটি অনুসন্ধান করো না।' (সূরা হুজুরাতঃ ১২)

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে হাদীস

ক. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস লাভে গোপনীয়তার সাহায্য নাও। কারণ প্রত্যেক নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার শিকার। (তাবারানীর মুজামুস্ সগীর থেকে)

খ. হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স. আমার নিকট একটি গোপন কথা বলেছিলেন। নবী করীম স. এর মৃত্যুর পরও আমি তা কারও নিকট প্রকাশ করিনি। আমার নিকট তা (আমার মাতা) উম্মে সুলাইমও জানতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি তা তার নিকটও বলিনি। (বুখারী)

গ. হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, (এশার) নামাযের আযান হয়ে গেল। তখনও এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স. এর সাথে গোপনে আলাপ করছিল এবং দীর্ঘক্ষণ ধরেই এ আলাপ করে যাচ্ছিল। এমন কি তাঁর সাহাবারা ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. উঠে নামায পড়লেন। (বুখারী)

ঘ. বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী স. বলেনঃ 'তোমাদের অনুমতি ছাড়া যেন তোমাদের অপছন্দনীয় কেউ তোমাদের ঘরে প্রবেশ না করে।'

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে টেলিফোনে আড়ি পাতার যে আইন বলবৎ হয়েছে তা বৃহত্তর নাগরিক স্বার্থে জারি করা হয়েছে মর্মে বলা হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এর অপব্যবহারেরও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। সরকারী দল-বিরোধী দলসহ দেশের আইন বিশেষজ্ঞদের

সাথে পরামর্শ গ্রহণ এবং গভীরভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করেই আইনটি জারি করা উচিৎ ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিফোনে আড়িপাতার বিধান থাকলেও তাঁরা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে এ কাজটি করে থাকে।

কতিপয় সুপারিশ ঃ

ক. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যদি কোন কারণে টেলিফোনে আড়ি পাতার প্রয়োজন পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে আদালতের পূর্বানুমতি নিয়েই তা করা সমীচীন হবে।

খ. আড়িপাতা বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিবেচনায় রেখে এর অপপ্রয়োগ রোধ কল্পে উপযুক্ত রক্ষাকবচ রাখা উচিত।

গ. এ আইনের কোন অপপ্রয়োগ হলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

ঘ. আইনটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িক সময়ের জন্যেই বলবৎ রাখা উচিৎ।

ইসলামী আইন ও বিচার
এপ্রিল-জুন ২০০৬
বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা : ১০৬-১০৮

যৌন অপরাধ : আল-কুরআনের বিধান

মু. শওকত আলী

যৌন ব্যবহারে সতীত্ব

১. যিনার নিকটও যেও না। এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং অতীব নিকৃষ্ট পথ। (সূরা বনী-ইসরাঈল আয়াত-৩২)

২. নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বীয় মালিকানাধীন দাসী ছাড়া যারা নিজেদের যৌনঅংগ সংযত রাখে তাদের প্রতি কোন তিরস্কার ভৎর্সনা নেই। তবে এরা ছাড়াও যারা আরো চাইবে তারাই সীমা লংঘনকারী। (সূরা মা'আরিজ আয়াত– ৩০-৩১)

যৌন অসতীত্ব

১. ব্যভিচারী মেয়েলোক ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই ১০০টি কোড়া মার। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। আর তাদেরকে শাস্তি দানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।

২. ব্যভিচারী যেন বিবাহ না করে ব্যভিচারিণী বা মোশরেক স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কাউকে। আর ব্যভিচারীণীকে বিবাহ করবে না ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া আর কেউ। এটা ঈমানদার লোকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। (সূরা নূর আয়াত ২-৩)

অসতীত্বের অপবাদ

১. আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে তারপর ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে তাদেরকে ৮০টি কোড়া মার। আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।

২. সে লোকরা নয় যারা এরপর তওবা করবে ও সংশোধন করে নেবে। আল্লাহ অবশ্যই (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা নূর আয়াত ৪-৫)

নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অসতীত্বের অভিযোগ

১. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে অথচ তাদের কাছে নিজেরা ছাড়া অপর কোন সাক্ষী নেই তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সাক্ষ্য (এই যে, সে) চার বার আল্লাহর নামে

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

কছম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, আর পঞ্চমবার বলবে তার ওপর আল্লাহর লানত হোক যদি সে (আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়।

২. আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এইভাবে বাতিল হতে পারে যে সে চার বার আল্লাহর নামে কছম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে এ ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগ) মিথ্যবাদী। আর পঞ্চম বারে সে বলবে যে এ দাসীর ওপর আল্লাহর গজব পড়ুক যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়। (সূরা নূর আয়াত ৬-৯)

৩. যারা পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন, সাদাসিধা ও মোমেন স্ত্রীলোকদের ওপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে তাদের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতের লানত, আর তাদের জন্য বড় আযাব রয়েছে। (সূরা নূর আয়াত ২৩)

ব্যভিচার

তোমাদের স্ত্রী লোকদের মধ্যে যারাই ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী গ্রহণ কর। এই চার জন লোক যদি সাক্ষ্যদান করে তবে তাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখ যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়। অথবা আল্লাহ্ নিজেই তাদের জন্য কোন পথ বের করে দেন। (সূরা নিসা আয়াত ১৫)

সমকামিতা

আর তোমাদের মধ্য হতে যারা এ কাজটি করবে সে দুজনকেই শাস্তি দাও। অতপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদেরকে নিস্কৃতি দাও। কেননা আল্লাহ মহান তওবা গ্রহণকারী ও অনুগ্রহ দানকারী। (সূরা নিসা আয়াত ১৬)

সাধারণ ও সামাজিক অপরাধ

সমাজের ক্ষতিকর বেআইনী কাজ

যারা আল্লাহ এবং তার রসূলের সাথে লড়াই করে এবং জমিনে ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এ দুনিয়ায় কিন্তু পরকালে তাদের জন্য তা অপেক্ষা কঠিনতম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা আল মায়েদা আয়াত ৩৩)

ঘুষ

এবং তোমরা পারস্পরিক ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না, আর বিচারকদের সম্মুখে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ ইচ্ছা করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে। (সূরা আল বাকারা আয়াত ১৮৮)

নেশা ও জুয়া

১. লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ? বলে দাও এ দুটো জিনিসেই বড় পাপ রয়েছে। যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতা আছে। কিন্তু উভয় কাজের পাপ উপকারিতা হতে অনেক বেশি। (সূরা বাকারা আয়াত ২১৯)

২. (ক) হে ঈমানদার লোকেরা শরাব, জুয়া ও মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর সবই ঘৃণ্যবস্তু শয়তানী কাজ। তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

(খ) শয়তান তো চায় যে শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বিরত রাখবে। এখন তোমরা কি এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে? (সূরা আল মায়েদা আয়াত ৯০-৯১)

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লংঘন

১. হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যলোকদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়। আশা করা যায় যে তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে।

২. সেখানে যদি কাউকে না পাও তবে ঘরে প্রবেশ করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যাও। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা খুব ভালভাবে জানেন।

৩. অবশ্য তোমাদের জন্য এতে কোন দোষ নেই যে তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করবে যা কারো বসবাসের জায়গা নয়, আর যেখানে তোমাদের কোন উপকারের বা কাজের জিনিস পড়ে রয়েছে। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর আর যা কিছু গোপন কর সব বিষয় আল্লাহ জানেন। (সূরা আন নূর আয়াত ২৭-২৯)

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা ....

.... ফোন/মোবাইল: ....

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে .... টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (..)।

স্বাক্ষর
ম্যানেজার

স্বাক্ষর

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ৩০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৪০% কমিশন

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) =৩৫৪=১৪০/=
=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫৮=২৮০-১০=২৭০/=
=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য- (বার সংখ্যা) =৩৫ ১২=৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : 01712-827276
E-mail : ilrclab@yahoo.com

বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৬ এপ্রিল-জুন - ২০০৬

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার